১৮০০। হাদীছ ঃ عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة انّ نبيّ الله صلّى الله
عليه وسلّم حدّثهم عن ليلة اسرى به بينما انا فى الحطيم مضطجعا اذ اتانى آت
فشقّ ما بين هذه الى هذه يعنى به من ثغرة نحره الى شعرته فاستخرج قلبى ثمّ
اتيت بطست من ذهب مملوءة ايمانا فغسل قلبى ثمّ حشى ثمّ اعيد ـ ثمّ اتيت بدابّة
دون البغل وفوق الحمار ابيض فقال له الجارود وهو البراق يا ابا حمزة قال انس نعم
يضع خطوه عند اقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بى جبرائيل حتّى اتى السّماء
الدّنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمّد قيل وقد
ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجئ جاء ففتح فلمّا خلصت فاذا فيها آدم
هذا ابوك آدم فسلّم عليه فسلّمت عليه فردّ السّلام ثمّ قال مرحبا بالابن الصّالح
والنّبىّ الصّالح ثمّ صعدبى حتّى اتى السّماء الثّانية فاستفتح قيل من هذا قال
جبرائيل ـ ....

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) মালেক ইবনে সা'সাআ'হ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যেই রাত্রে আল্লাহ তাআলা পরিভ্রমণে নিয়া গিয়াছিলেন সেই রাত্রের ঘটনা বর্ণনায় ছাহাবীগণের সম্মুখে তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতীমে (উপনীত হইলাম এবং তখনও আমি ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত) ঊর্ধ্বমুখী শায়িত ছিলাম, হঠাৎ এক আগন্তুক (জিব্রাঈল ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন (এবং আমাকে নিকটবর্তী জমজম্ কূপের সন্নিকটে নিয়া আসিলেন)। অতপর আমার বক্ষের ঊর্ধ্ব সীমা হইতে পেটের নিম্ন সীমা পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিলেন এবং আমার হৃদয় বা দিলটা বাহির করিলেন। অতপর একটি স্বর্ণপাত্র উপস্থিত করা হইল, যাহা ঈমান (পরিপক্ব সত্যিকার জ্ঞান বর্ধক) বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। আমার দেলটাকে (জমজমের পানিতে) ধৌত করিয়া তাহার ভিতরে ঐ বস্তু ভরিয়া দেওয়া হইল এবং দেলটাকে নির্ধারিত স্থানে রাখিয়া আমার বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইল (বন্ধনীর বিষয়গুলি ৪৫৫-৪০৬ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে)।

অতপর আমার জন্য খচ্চর হইতে একটু ছোট, গাধা হইতে একটু বড় শ্বেত বর্ণের একটি বাহন উপস্থিত করা হইল তাহার নাম "বোরাক", যাহার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। সেই বাহনের উপর আমাকে সওয়ার করা হইল।

ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়া জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে লইয়া নিকটবর্তী তথা প্রথম আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। ভিতর হইতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল, জিব্রাঈল স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। অতপর জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? জিব্রাঈল বলিলেন, মুহাম্মদ (সঃ) আছেন। বলা হইল, (তাঁহাকে নিয়া আসিবার জন্যই ত আপনাকে) তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ। তারপর আমাদের প্রতি মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। গেটের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় আদম (আঃ)-কে দেখিতে পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া বলিলেন, তিনি আপনার আদি পিতা আদম (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। আমার সালামের উত্তরদানে তিনি আমাকে "সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী' আখ্যায়িত করিলেন এবং খোশ আমদেদ জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। এখানেও পূর্বের ন্যায় কথোপকথন হইল এবং শুভেচ্ছা মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম; তাঁহাদের উভয়ের নানী পুরস্পর ভগ্নী ছিলেন। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহাদের পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সালাম করিলাম। তাঁহারা আমার সালামের উত্তর প্রদানে "সুযোগ্য ভ্রাতা সুযোগ্য নবী" বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। তথায়ও পূর্বের ন্যায় কথোপকথনের পর শুভেচ্ছা-স্বাগত জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন; আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দান করতঃ আমাকে "সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী" বলিয়া মোবারকবাদ জানাইলেন।

অতপর আমাকে লইয়া জিব্রাঈল চতুর্থ আসমানের নিকটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। সেখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তরের পর শুভেচ্ছা স্বাগত জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা তথায় ইদ্রীস (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মারহাবা জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এই স্থানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর চলার পর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ দানের সহিত দরজা খোলা হইল। আমি ভিতরে পৌঁছিয়া হারুন (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন। আমি সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন।

তারপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানের গেটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে জিব্রাঈল স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, অতপর তাঁহার সঙ্গে কে আছে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সঃ); বলা হইল, তাঁহাকে ত নিয়া আসিবার জন্য আপনাকে পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ। তৎক্ষণাত শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। তথায় প্রবেশ করিয়া মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত করিয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মোবারকবাদ জানাইলেন।

যখন আমি এই এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলাম তখন মূসা (আঃ) কাঁদিতেছিলেন। তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি কাঁদিতেছি এই কারণে যে, আমার উম্মতে বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা এই নবীর উম্মতের বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে, অথচ তিনি বয়সের দিক দিয়া যুবক এবং দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছেন আমার পরে।

তারপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের প্রতি আরোহণ করিলেন এবং তাহার দ্বারে পৌঁছিয়া গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পূর্বের ন্যায় সকল প্রশ্নোত্তরই হইল এবং দরজা খুলিয়া শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হইল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তথায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাত লাভ হইল। জিব্রাঈল আমাকে বলিলেন, তিনি আপনার (বংশের আদি) পিতা, তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য পুত্র, সুযোগ্য নবী বলিয়া মারহাবা ও মোবারকবাদ জানাইলেন।

ثم رفيت الى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل اذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وذا اربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبرائيل قال اما الباطنان فنهران فى الجنة واما الظاهران فانيل والفرات ـ ثم رفع الى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم اتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن فقال هى الفطره انت عليها وامتك ـ ثم فرضت على الصلوات خمسين صلوة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قال امرت بخمسين صلوة كل يوم قال ان امتك لا تستطيع خمسين صلوة كل يوم وانى والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لامتك ـ فرجع فوضع عنى عشرا فرجعت الى موسى فقال مثله فرجت فوضع عننى عشرا فرجعت الى فقال مهله فرجعت فامرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فامرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت الى موسى فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلوات كل يوم ـ قال ان امتك لاتستطيع خمس صلوات كل يوم وانى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لامتك قال سالت ربي حتى استحييت ولكنى ارضى واسلم قال فلما جاوزت نادى مناد امضيت فريضتى وخففت عن عبادى ـ

অর্থ ঃ অতপর আমি সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহার নিকট উপনীত হইলাম। (তাহা এক বড় প্রকাণ্ড কুল বৃক্ষবিশেষ,) তাহার এক একটা কুল "হজর" অঞ্চলে তৈয়ারী (বড় বড়) মটকার ন্যায় এবং তাহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। জিব্রাঈল আমাকে বলিলেন, এই বৃক্ষটির নাম "সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহা"। তথায় চারিটি প্রবাহমান নদী দেখিতে পাইলাম- দুইটি ভিতরের দিকে প্রবাহিত এবং দুইটি বাহিরের দিকে। নদীগুলি সম্পর্কে আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ভিতরের দুইটি বেহেশতে প্রবাহমান (সাল্‌সাবীল ও কাওসার নামক) দুইটি নদী। আর বাহিরের দিকে প্রবাহমান দুইটি হইল (ভূ পৃষ্ঠের মিসরে প্রবাহিত) নীল ও (ইরাকে প্রবাহিত) ফোরাত (নদী বা তাহাদের নামের মূল উৎস)।

তারপর আমাকে "বায়তুল মা'মুর" পরিদর্শন করান হইল। তথায় প্রতিদিন (এবাদতের জন্য) সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া থাকেন (যে দল একদিন সুযোগ পায় সেই দল চিরকালের জন্য দ্বিতীয় দিন সুযোগ প্রাপ্ত হয় না)।

অতপর (আমার সৃষ্টিগত স্বভাবের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা প্রকাশ করিয়া দেখাইবার উদ্দেশে পরীক্ষার জন্য) আমার সম্মুখে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হইল- একটিতে ছিল সুরা বা মদ, অপরটিতে ছিল দুগ্ধ আর একটিতে ছিল মধু। আমি দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম। জিব্রাঈল বলিলেন, দুগ্ধ সত্য ও খাঁটি স্বভাগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ; (সুতরাং আপনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে,) আপনি সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার উসিলায় আপনার উম্মতও তাহার উপর

থাকিবে।*

তারপর আমার শরীয়তে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বিধান করা হইল। আমি ফিরিবার পথে মূসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী পথ অতিক্রম করাকালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ আদেশ কি লাভ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পঞ্চাম ওয়াক্ত নামায। মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায় আদায় করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। আমি সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; এবং বনী ইস্রাঈলগণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি; সুতরাং আপনি পরওয়ারদেগারের দরবারে আপনার উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও সহজ করার আবেদন করুন।

হযরত (সঃ) বলেন, আমি পরওয়ারদেগারের খাস দরবারে ফিরিয়া গেলাম। পরওয়ারদেগার (দুইবারে পাঁচ পাঁচ করিয়া) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। অতপর আমি আবার মূসার নিকট পৌছিলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় পরামর্শই আমাকে দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এইবারও (ঐরূপে) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। পুনরায় মূসার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে এইবারও সেই পরামর্শই দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এবং (পূর্বের ন্যায়) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। এইবারও মূসার নিকট পৌছিলে পর তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম, এইবার আমার জন্য প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইবারও মূসার নিকট পৌছিলে পর আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আদেশ লাভ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও পাবন্দী করিতে পারিবে না। আমি আপনার পূর্বেই সাধারণ মানুষের স্বাভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলগণকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছি। আপনি আবার পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া আরও কম করার আবেদন জানান।

হযরত (সঃ) বলেন, আমি মূসাকে বলিলাম, পরওয়ারদেগারের দরবারে অনেক বার আসা-যাওয়া করিয়াছি; এখন আবার যাইতে লজ্জা বোধ হয়, আর যাইব না বরং পাঁচ ওয়াক্তের উপরই সন্তুষ্ট রহিলাম এবং তাহা বরণ করিয়া নিলাম। হযরত (সঃ) বলেন, অতপর যখন আমি ফিরিবার পথে অগ্রসর হইলাম তখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে একটি ঘোষণা জারি করা হইল– (বান্দাদের প্রাপ্য সওয়াবের দিক দিয়া) "আমার নির্ধারিত সংখ্যা (পঞ্চাশ) বাকী রাখিলাম, (আমার পক্ষে আমার বাক্য অপরিবর্তিতই থাকিবে। ৪১৭ ও ৪৫৫ পৃষ্ঠার হাদীছ দ্রষ্টব্য) অবশ্য কর্মক্ষেত্রে বান্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করিয়া দিলাম। (অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত রহিল, কিন্তু সওয়াবের দিক দিয়া পাঁচই পঞ্চাশ পরিগণিত হইবে।) প্রতিটি নেক আমলে দশ গুণ সওয়াব দান করিব।

মে'রাজ শরীফের বর্ণনার হাদীছ বোখারী (রঃ) মে'রাজের পরিচ্ছেদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে ঐসব হাদীছের অনুবাদ দেওয়া হইল।

১৮০১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০) আনাছ (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, আবু যর (রাঃ) হাদীছ বয়ান করিয়াছেন– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মক্কায় থাকাকালীন একদা রাত্রে আমি যেই ঘরে শায়িত ছিলাম সেই ঘরের ছাদ খুলিয়া গেল, অতপর ঐ পথে জিব্রাঈল (রাঃ) অবতরণ করিলেন। (আমাকে ঐ ঘর হইতে কা'বা গৃহের নিকটবর্তী নিয়া আসা হইল।) তারপর আমার বক্ষ খুলিয়া জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইল এবং একটি স্বর্ণ পাত্র উপস্থিত করা হইল যাহা পরিপক্ব জ্ঞান ও সত্যিকার ঈমান বর্ধক বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল; তাহা আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অতপর (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) জিব্রাঈল (আঃ) আমারহাত ধরিয়া আমাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। নিকটবর্তী

* মদ ও দুগ্ধপাত্র উপস্থিত করার পরীক্ষার সম্মুখীন হযরত (সঃ) দুই বার হইয়াছিলেন। একবার প্রথমে– যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়াছিলেন তখন যাহার উল্লেখ সম্মুখের এক হাদীছে আসিতেছে। দ্বিতীয়বার উর্ধ্ব জগতে যাহার উল্লেখ এস্থানে হইয়াছে।

(তথা প্রথম) আসমানের দ্বারে পৌঁছিয়া জিব্রাঈল (আঃ) আসমানের পাহারাদারকে দরজা খুলিতে বলিলেন। তখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল। জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় পরিচয় দান করিলেন। পাহারাদার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কেহ আছেন কি? জিব্রাঈল বলিলেন, হা- আমার সঙ্গে আছেন মুহাম্মদ (সঃ)। পাহারাদার বলিলেন, তাঁহার নিকইত (আপনাকে) পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ।

অতপর যখন আমরা ঐ আসমানে পৌঁছিলাম দেখিতে পাইলাম, একজন লোক বসিয়া আছেন- তাঁহার ডান দিকে একদল লোক এবং বাম দিকে আর একদল লোক। ঐ লোকটি যখন তাঁহার ডান দিকে তাকান তখন হাসিয়া উঠেন এবং যখন বাম দিকে তাকান কাঁদিয়া উঠেন। হযরত (সঃ) বলেন, ঐ লোকটি আমাকে "সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য পুত্র" বলিয়া স্বাগত জানাইলেন এবং জিব্রাঈলের নিকট হইতে তাঁহার পরিচয়ও পাইলাম। জিব্রাঈল বলিয়াছেন যে, তিনি হইলেন আদম (আঃ); তাঁহার ডান বাম দিকের আকৃতিগুলি তাঁহার বংশধরগণের রূহ বা আত্মাসমূহ। ডান দিকেরগুলি যাহারা বেহেশত লাভ করিবে এবং বাম দিকেরগুলি যাহারা দোযখবাসী হইবে; অতএব এই কারণে তিনি ডান দিকে তাকাইলে (আনন্দে) হাসিয়া উঠেন এবং বাম দিকে তাকাইলে (অনুতাপ আক্ষেপে) কাঁদিয়া উঠেন।

১৮০২। হাদীছ ঃ عن ابن عباس وابا حبة الانصارى كانا يقولان قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِيْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ - ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى بِى السِّدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَاَدْرِىْ مَاهِىَ ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

অর্থ ঃ আব্বাস (রাঃ) ও আবু হাব্বাহ্ আনসারী (রাঃ) উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ করার পর আমাকে মহাঊর্ধ্বে আরোহিত করা হইল; আমি এক সুসমতল ময়দানে পৌঁছিলাম; তথায় শুধুমাত্র কলম বা লেখনী চালনার শব্দ শুনা যাইতেছিল।

অতপর আমাকে লইয়া জিব্রাঈল আরও অগ্রসর হইলেন এবং সিদরাতুল মোনতাহার নিকট পৌঁছিলেন। ঐ সময় সিদরাতুল মোনতাহাকে বিভিন্ন বর্ণের রঙমালা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা যে কি ছিল তাহার সঠিক তথ্য আমি তলাইয়া দেখি নাই। তারপর আমাকে বেহেশতের ভিতরে প্রবেশ করান হইল। তাহার গুম্বজসমূহ মুক্তা দ্বারা তৈয়ারী ছিল এবং তাহার যমীন ছিল মেশ্‌ক বা কস্তুরীর।

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত সৃষ্ট জগত পরিচালনার ভার ফেরেশতাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি নির্দেশাবলী আসিতে থাকে। সেই সব লেখার কেন্দ্রই ছিল উক্ত সমতল ময়দান, যাহার পরিদর্শনে হযরত (সঃ) তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। সিদরাতুল মোনতাহাকে আচ্ছাদনকারী রঙমালা কি ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বয়ান মুসলিম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে, তাহা ছিল فواش من ذهب স্বর্ণদেহী পতঙ্গসমূহ।

আর এক হাদীছে উল্লেখ আছে, (মে'রাজ উপলক্ষে) বহু সংখ্যক ফেরেশতার এক দল আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করিয়াছিলেন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দর্শন লাভের। আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অনুমদিত দিয়া দিলেন, সেমতে তাঁহারা সিদ্‌রাতুল মোনতাহার নিকটে হযরতের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর ভিড় জমাইয়াছিলেন। (তফসীর রূহুল মাআ'নী, ২৭-৫১)

সম্ভবতঃ ঐ ফেরেশতাগণই স্বর্ণদেহী পতঙ্গের আকৃতিতে ঝাঁক বাঁধিয়া সিদরাতুল মোনতাহার উপর পতিত ছিলেন। তাহাই অন্য এক হাদীছে আছে- নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আমি সিদরাতুল মোনতাহার প্রতিটি পাতায় এক একজন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার তসবীহ- "ছোবহানাল্লাহ" পাঠরত দেখিয়াছি।

(তফসীর রূহুল মাআ'নী, ২৭-৫১)

এতদ্ভিন্ন নিরাকার নিরাধার আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লী বা বিকাশও সিদরাতুল মোনতাহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিল, যেই নূরের সামান্যতম তাজাল্লী হযরত মূসার সম্মুখে তুর পর্বতের উপর হইয়াছিল এবং তাহাই ভূমিকা ছিল আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের, যাহার আকাঙ্ক্ষা হযরত মূসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই নূরের তাজাল্লীতে পর্বত স্থির থাকিতে পারে নাই, ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)ও ঠিক তাকিতে পারেন নাই, চেতনা হারাইয়া ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন নাই (বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ডে হযরত মূসার বয়ান)।

পক্ষান্তরে সেই নূর ও ভূমিকা দর্শনের সুযোগই এই স্থানে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করা হইয়াছিল। এস্থলে সেই নূর বিকাশের বাহক বা স্থান সিদরাতুল মোনতাহাও স্থির রহিয়াছিল এবং তাহার দর্শক মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)ও সম্পূর্ণ সুস্থ সচেতন ছিলেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা–ما زاغ البصر وما طغى তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধি শক্তি সুষ্ঠু সতেজ ছিল; বিন্দুমাত্র অতিক্রম বাতিক্রম ঘটে নাই।

তাই বলা হয়, আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ভূমিকায়ই মূসা (আঃ) স্থিরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, لن ترانى এই অবস্থায় আমার দর্শন লাভ আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইবে না। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মে'রাজ উপলক্ষে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধিশক্তি সতেজ সুষ্ঠু রাখিয়া আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ফলে তিনি স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দিদার বা দর্শনও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

হযরতের আগমন উপলক্ষে যে সিদরাতুল মোনতাহার উপর আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লী হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ হাদীছেও আছে এবং সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বসরী (রাঃ)ও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (রূহুল মাআ'নী ২৭–৫১)

১৮০৩। হাদীছ ঃ পৃঃ ৪৮১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণের রাত্রে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার দেহ প্রশস্ততায় মধ্যম আকারের ছিল। (তিনি দীর্ঘ কায়ার শ্যামলা রংয়ের ছিলেন।) তাঁহার মাথার চুল সোজা ছিল, কোঁকড়ানো ছিল না। তাঁহার দৈহিক আকৃতি "শানুয়া" গোত্রীয় লোকদের ন্যায় ছিল। ঈসা (আঃ)-কেও দেখিয়াছি, তিনি ছিলেন মধ্যম কায়া-বিশিষ্ট এবং রং ছিল গোরা, তিনি এমন পরিচ্ছন্ন দেখাতেছিলেন যেন এখনই গোসল করিয়া আসিয়াছেন। (তাঁহার মাথার চুল কিছুটা কোঁকড়ানো।) ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখিয়াছি, আমার আকৃতি তাঁহার আকৃতির সর্বাধিক নিকটতম। তারপর আমার সম্মুখে (পরীক্ষাস্বরূপ) দুইটি পাত্রও উপস্থিত করা হইয়াছিল– একটিতে দুগ্ধ অপরটিতে সুরা বা মদ। আমাকে বলা হইয়াছিল, যেইটাই আপনার ইচ্ছা পান করুন। (তখন মদ হারাম ছিল না।) আমি দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম এবং দুগ্ধ পান করিলাম। তখন বলা হইল, আপনি সঠিক সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ– দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন; (ইহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত এই ধর্ম অবলম্বন করিবে।) পক্ষান্তরে যদি আপনি (সকল প্রকার গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল) মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত সেই পথের পথিক হইয়া গোমরাহ হইত। এতদ্ভিন্ন হযরত (সঃ) দোযখের প্রধান কর্মকর্তা ফেরেশতা "মালেক" এবং দাজ্জালের উল্লেখও করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলে করীমের সম্মুখে মদের পেয়ালা ও দুগ্ধের পেয়ালা উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষার ভাল মন্দ ফলাফল সম্পর্কেও ফেরেশতা জিব্রাঈল ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। ১৮০০ নং হাদীছে ভাল ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, দুগ্ধ হইল সকলের পক্ষে স্বভাবগত আকর্ষণীয় এবং অতি উত্তম বস্তু, তাহাকে সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ বা প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল; সুতরাং আপনি আপনার সমগ্র উম্মতের প্রধান হইয়া তাহা গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব আপনার নিম্নস্থদের তথা উম্মতগণের উপর এই হইবে যে, তাহারাও সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আলোচ্য হাদীছে তাহার

বিপরীত মন্দ ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, মদ হইল সব রকম গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল; তাহা গোমরাহী ও ব্যভিচারের পথের স্বরূপ ও প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছ। সুতরাং আপনি সমগ্র উম্মতের মুরব্বী ও প্রধান হইয়া যদি তাহা গ্রহণ করিতেন তবে স্বাভাবিকরূপে তাহার প্রভাব প্রতিক্রিয়া উম্মতগণের উপর এই হইত যে, তাহারাও গোমরাহীর পথের পথিক হইত।

এই ফলাফলের সূত্র অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু অপরিহার্য ও বাস্তব এবং বিশেষ উপদেশমূলক। বর্তমানেও আমরা জাতীয় জীবনের শত শত ব্যাপারে উপরস্থ নেতা, কর্তা ও প্রধানদের ক্রিয়াকলাপ এবং স্বভাব-চরিত্রের যে প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখি তাহা উক্ত সূত্রের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের নেতা ও প্রধানগণ এই উপদেশের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ না করায় সর্বসাধারণের অবৈধ ক্রিয়াকলাপের গোনাহের বোঝা তাহাদের ঘাড়েও চাপিবে।

১৮০৪। হাদীছ ঃ পৃঃ ৪৫৯) আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন, বিশ্বমুসলিমের নবীর পিতৃব্য পুত্র ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজ উপলক্ষ্যে মূসা (আঃ)-কে দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন গোধূম বা শ্যামলা বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট মানুষ; তাঁহার দেহ পাকা-পোক্ত–"শানুয়া" গোত্রীয় লোকদের ন্যায়। ঈসা (রাঃ)-কেও দেখিয়াছি; তিনি ছিলেন মধ্যম কায়াবিশিষ্ট। তাঁহার অঙ্গসমূহ অত্যন্ত সাঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, মাথার চুল প্রায় সোজা ছিল।

এতদ্ভিন্ন আমি দোযখের প্রধান কর্মকর্তা মালেক এবং দাজ্জালকেও দেখিয়াছি। এই সব ছিল বড় বড় নিদর্শনসমূহের অন্তুর্ভক্ত যাহা আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখাইয়াছেন।

বায়তুল মোকাদ্দাসে উপস্থিতি

মে'রাজের ঘটনায় হযরত (সঃ) সরাসরি মক্কা হইতে আসমানের দিকে যান নাই; মক্কা হইতে বিদ্যুৎ গতিতে বোরাকে আরোহণপূর্বক প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৮০৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৮৪) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণের রাত্রে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইলে পর তাঁহার সম্মুখে দুইটি পাত্র উপস্থিত করা হইল। একটি সূরা বা মদের দ্বিতীয়টি দুগ্ধের। হযরত (সঃ) উভয় পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; (তখন মদ হারাম ছিল না, কিন্তু হযরত (সঃ) মদের, পাত্র ছুঁইলেনও না,) এবং দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। এতদ্দৃষ্টে জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আপনাকে সত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের স্বরূপ তথা দুগ্ধের প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত গোমরাহী ও ব্যভিচারে পতিত হইত।

ব্যাখ্যা ঃ একই বিষয়ের পরীক্ষা সাধারণভাবেও একাধিক বার হইয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পরীক্ষাটির সম্মুখীনও হযরত (সঃ) দুই বার হইয়াছিলেন। একবার ভূপৃষ্ঠে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়া, দ্বিতীয়বার উর্ধ্ব জগতে পৌছিয়া সপ্তম আকাশ পার হওয়ার পর .....যাহার উল্লেখ ১৫৯৯ নং ও ১৬২০ নং হাদীছে হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মুসলিম শরীফের একটি হাদীছে এই–

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) আমার জন্য বোরাক উপস্থিত করা হইল। তাহার রং সাদা, গাধা অপেক্ষ বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট, তাহার পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায় পৌছাইতে সক্ষম। সেই দ্রুতগামী বাহনে আমি আরোহণ করিলাম এবং বায়তুল মোক্বাদ্দাস মসজিদে পৌছিলাম। সেই মসজিদের নিকটবর্তী লোহার কড়ি বিশেষ একটি ছিদ্রযুক্ত পাথর ছিল যাহার সঙ্গে পূর্ববর্তী নবীগণ এই মসজিদে আসিলে নিজ বাহন বাঁধিয়া থাকিতেন। হযরত (সঃ)

বলেন, আমিও বোরাককে তাহার সহিতই বাঁধিলাম এবং মসজিদে দুই রাকাত নামায পড়িলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) মে'রাজের রাত্রির ভোর বেলা যখন লোকদের নিকট ঘটনা প্রকাশ করিলেন তখন তিনি প্রথমে ঘটনার এই অংশটুকুই বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,আমি অদ্য রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে গিয়াছিলাম এবং এই রাত্রেই ফিরিয়া আসিয়াছি* আবু জাহল ইত্যাদি কাফেররা এতটুকু শুনিয়াই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কারণ সাধারণভাবে মক্কা হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস দীর্ঘ এক মাসের পথ; আসা-যাওয়ায় দুই মাস ব্যয় হওয়া আবশ্যক। কাফেররা এই ব্যাপারে হযরতের পরীক্ষা লওয়ার জন্য কা'বা গৃহের নিকটে জমায়েত হইল এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিতে লাগিল। হযরত (সঃ) বিভ্রাটে পড়িলেন, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুঁটিনাটির খোঁজ কে লইয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহর মহিমা তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থায় হযরত (সঃ) তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন।

১৮০৬। হাদীছ ঃ (৬৮৪) عن جابر رضى الله تعالى عنه انّه سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ (حِيْنَ أُسْرِىَ بِىْ اِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ) قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ ـ

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবৃতি শুনিয়াছেন– তিনি বলিলেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) রাত্রি বেলায় বায়তুল মোকাদ্দাস পরিভ্রমণের কথা যখন আমি কোরায়শগণের নিকট প্রকাশ করিলাম এবং তাহারা অবিশ্বাস (করিয়া আমাকে পরীক্ষা) করিতে চাহিল, তখন আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতীমের মধ্যে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। আল্লাহ তাআলা বায়তুল মোকাদ্দাস গৃহকে আমার সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। আমি কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে বায়তুল মোকাদ্দাসের নিদর্শনসমূহ দেখিয়া দেখিয়া বর্ণনা করিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান "টেলিভিশন" যুগে এই হাদীছের বাস্তবতা অনুধাবন অতি সহজ। যদিও বায়তুল মোকাদ্দাস গৃহ মক্কা হইতে বহু দূরে এবং অনেক পাহাড় পর্বতের আড়ালে অবস্থিত, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার পক্ষে যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ কাজ মোটেই কঠিন নহে, যে কাজ মানুষ টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে করিতে পারিয়াছে।

মে'রাজ উপলক্ষে হযরত (সঃ) কি কি পরিদর্শন করিয়াছেন

পূর্বের বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত (সঃ) মে'রাজ উপলক্ষে (১) আসমান, (২) পূর্ববর্তী বিশিষ্ট নবীগণ, (৩) বায়তুল মা'মুর, (৪) সিদরাতুল মোনতাহা, (৫) সুসমতল ময়দান, (৬) বেহেশত, (৭) দোযখের প্রধান কর্মকর্তা "মালেক", (৮) দজ্জাল ইত্যাদি দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন হাদীছে আরও বিশেষ বিশেষ বস্তুনিচয়ের উল্লেখ আছে। এস্থানেও কতিপয় হাদীছ "আল খাসায়েসুল কোবরা" নামক কিতাব হইতে উল্লেখ করিতেছি।

হাউজে কাওসার

(১) আনাছ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে আছে– হযরত (সঃ) বলেন, অতপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে

* কাফেরগণ ঊর্ধ্ব জগতের বস্তুনিচয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বায়তুল মোকাদ্দাসের সঙ্গে ভালরূপেই পরিচিত ছিল, তাই হযরত (সঃ) তাহাদের সম্মুখে বায়তুল মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি বরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনেও কাফেরদের বিরোধিতার প্রতিবাদে শুধু বায়তুল মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুরই উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য সূরা নাজ্‌মে পূর্ণ ঘটনার উপরেও আলোকপাত করা হয়াছে।

সপ্তম আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় আমি একটি প্রবাহমান জলাশয়ের নিকট পৌছিলাম– যাহার উভয় কূলে (আমার উপভোগের জন্য) মতি, হিরা ও ইয়াকুত পাথরের তৈয়ারী কুঠি বা বাংলাসমূহ ছিল এবং ঐ নহরের মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর পাখীও ছিল; ঐরূপ সুন্দর পাখী আর কোথাও দেখি নাই। জিব্রাঈলকে বলিলাম, পাখীগুলি বড়ই সুন্দর। জিব্রাঈল বলিলেন, যেসব লোক এই সব পাখী উপভোগ করিবেন তাঁহারা অধিক উত্তম হইবেন। অতপর জিব্রাঈল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি ইহা কোন নহর? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, ইহাই হইল "কাওসার।" আল্লাহ তাআলা যাহা শুধু আপনাকেই দান করিয়াছেন। তখন আমি অধিক আগ্রহের সহিত তাহা পরিদর্শন করিলাম। সেখানে সুসজ্জিতরূপে স্বর্ণ-রৌপ্যের উপর দিয়া পানি প্রবাহমান। তাহার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক সাদা। তথায় সাজান গ্লাসগুলি হইতে আমি একটি গ্লাস লইয়া ঐ পানি পান করিলাম– তাহা মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ।

(২) আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি হাউজে কাওসারের নিকট গমনকালে জিব্রাঈল বলিলেন, ইহাই হাউজে কাওসার যাহা আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। হযরত (সঃ) বলেন, আমি তাহার মাটি হাতে লইয়া দেখিলাম, তাহা অত্যধিক সুগন্ধময় কস্তুরী।

আ'রশ ঃ আবু হাম্‌রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে সপ্তম আসমানের পর আরশের নিকট পৌছিয়া দেখিলাম তাহার খাম্বায় লিখিত আছে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

দোযখ ঃ সোহায়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মে'রাজের ঘটনায় পরীক্ষামূলকভাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহুআলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে পানি তারপর মদ ও দুগ্ধের পবিত্র পেশ করা হইল। তিনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিলেন। তখন জিব্রাঈল বলিলেন, আপনি সঠিক সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ ও প্রতীক বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন; এই বস্তু প্রত্যেক প্রাণীর স্বাভাবিক খাদ্য। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহা আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ভ্রষ্টতার নিদর্শন হইত এবং ঐ স্থানে বসবাসকারী হইতে বাধ্য হইতেন। এই বলিয়া ঐ প্রান্তের প্রতি ইশারা করিলেন যেই প্রান্তে জাহান্নাম অবস্থিত। হযরত (সঃ) দেখিলেন, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর লেলিহান অগ্নিশিখা উত্তেজিত আকারে উত্থিত হইতেছে।

পরজগতের বস্তুনিচয়

হোযায়ফা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলিয়াছেন, সপ্ত আসমান ভ্রমণ করা পর্যন্ত "বোরাক" সব সময়ই হযরতের সঙ্গে ছিল। অতপর হযরত (সঃ) বেহেশত দোযখও পরিদর্শন করিয়াছেন এবং আখেরাত বা পরজগতের যত বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দান করা হইয়াছে তাহার সবই পরিদর্শন করিয়াছেন। তারপর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গীবত বা পরনিন্দার আযাব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি এক দল লোকের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের হাতে সীসার তৈয়ারী বড় বড় নখ রহিয়াছে; তাহারা তাহা দ্বারা নিজেদের মুখ ও বক্ষ আঁচড়াইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? জিব্রাঈল বলিলেন, ইহা ঐ সব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্য লোকের গোশত খাইয়া থাকিবে– তথা (গীবত ও নিন্দা করিয়া) তাহাদের মান-ইজ্জত নষ্ট করিবে।

আমলহীন ওয়ায়েজ বা বক্তার আযাব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "মে'রাজ উপলক্ষে আমি এমন একদল লোকের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের ঠোঁট দোযখের আগুনের তৈয়ারী কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছিল। ঠোঁট কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুনঃ গজাইয়া উঠে এবং পুনরায় কাটিয়া ফেলা হয়। জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ সব বক্তা বা ওয়ায়েজ ব্যক্তিদের দৃশ্য যাহারা অন্যদেরকে যেসব নসীহত করিবে নিজে তাহার উপর আমল করিবে না।

সুদখোরের আযাব

(১) সামুরা ইবনে জুন্দব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি দেখিয়াছ, একটি মানুষ নদীর মধ্যে সাঁতরাইতেছে (কনারায় উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না)। পাথর মারিয়া মারিয়া তাহাকে হটাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা সুদ- খোরের অবস্থার দৃশ্য।

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি সপ্তম আকাশের উপরে দেখিলাম- তথায় ভীষণ বজ্রপাত, বিজলীর গর্জন এবং এক দল লোক দেখিলাম, তাহাদের পেট ঘরের সমান বড়- তাহার ভিতর অনেক সাপ কিলবিল করিতেছে যাহা পেটের বাহির দিক হইতে দেখা যায়। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, যাহারা সুদ খাইবে ইহা তাহাদের দৃশ্য।

বিভিন্ন গোনাহের আযাব

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) স্বয়ং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে মে'রাজের বিস্তারিত বর্ণনা দান করতঃ বলিয়াছেন- হযরত (সঃ) বলেন, প্রথম আসমানে পৌঁছিবার পর আমি একস্থানে দেখিতে পাইলাম কতিপয় দস্তরখানা বিছান আছে, তাহার উপর রান্না করা উত্তম গোশত রাখা আছে, কিন্তু তথায় উপস্থিত লোকগুলির কেহই ঐ গোশতের নিকটেও যায় না। পক্ষান্তরে নিকটেই অন্য কতিপয় দস্তরখানা রহিয়াছে যাহার উপর অতি দুর্গন্ধময় পচা গোশত রহিয়াছে, ঐ লোকগুলো তাহা খাইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ সব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট ব্যবহারের জন্য হালাল বস্তু থাকিবে, কিন্তু তাহারা সেই হালাল বস্তু উপেক্ষা করিয়া হারামে লিপ্ত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর এক দল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের পেট ঘরের সমান বড়; পেট লইয়া তাহারা উঠিতে পারে না, উঠিতে চেষ্টা করিলে অধঃমুখী আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাঁহারা ফেরআ'উনের লোক লস্করদের পিছনে পিছনে যাইতেছে; অধিকন্তু পথিকদের একটি বিরাট দল তাহাদিগকে পদতলে পিষ্ট করিতেছে, তাহারা আল্লার নিকট ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা সুদ খাইবে, ফলে কেয়ামতের দিন তাহারা ভূতের আছরকৃত পাগলের ন্যায় হইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম একদল লোক তাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় (মোটা ও বড় বড়); জবরদস্তিমূলক তাহাদের মুখ খুলিয়া ভিতরে পাথর প্রবেশ করান হয়। সেই পাথর

তাহাদের মলদ্বার দিয়া বাহির হয় এবং তাহারা আল্লাহ তাআলার নিকট ভীষণ চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকগুলির অবস্থা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল আত্মসাত করিবে। তাহারা বস্তুতঃ আগুনের অঙ্গার পেটের ভিতর ভরিবে এবং অচিরেই শাস্তি ভোগের জন্য ভয়ঙ্কর অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম একদল নারী, তাহাদের কতকগুলিকে পেস্তানে বাঁধিয়া শূন্যে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে মাথা নীচের দিকে করতঃ পা বাঁধিয়া লটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা সকলেই আল্লাহ তাআলার নিকট ভীষণ চীৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর নারীর দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব নারীর দৃশ্য যাহারা যেনা ব্যভিচার করিবে এবং সন্তান মারিয়া ফেলিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং এক দল লোক দেখিতে পাইলাম, তাহাদের বাহু কাটিয়া গোশত বাহির করা হইতেছে এবং সেই গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান হইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অপর ভাইয়ের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে।

কর্জে হাসানা বা ধার দেওয়ার সওয়াব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি বেহেশতের দরজায় লিখিত দেখিয়াছি, দান-খয়রাতের সওয়াব দশ গুণ আর কার্জ হাসানা বা ধার দানের সওয়াব আঠার গুণ। জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধার দেওয়া দান-খয়রাতের তুলনায় উত্তম কিরূপে? তিনি বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে যাঞ্চাকারী ভিক্ষা চাহিয়া থাকে, অথচ তাহার নিকট কিছুটা টাকা পয়সা আছে। পক্ষান্তরে সাধারণতঃ ধার কর্জ তখনই চাওয়া হয় যখন মানুষ অত্যধিক ঠেকে।

বিভিন্ন কার্যের পরিণাম

আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি মে'রাজের ঘটনা বয়ান করতঃ বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিব্রাঈল সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি এক দল লোক দেখিলেন, তাহারা জমিতে বীজ বপন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শস্য জন্মিয়া পাকিয়া যাইতেছে এবং স্বয়ংক্রিয়রূপে কাটিয়া পড়িতেছে, তাহারা স্তূপীকৃত করিতেছে এবং কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ ফসল জন্মিয়া যাইতেছে। হযরত নবী (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদকারীদের অবস্থার দৃশ্য। আল্লার রাস্তায় জেহাদকারীদের সওয়াব যে, বহুগুণে লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা ঐ পথে যাহা কিছু ব্যয় করেন তাহার সওয়াব যে, তাহাদের পরেও জারি থাকে উহারই রূপক দৃশ্য।

অতপর আর একদল লোককে দেখিলাম, যাহাদের মাথা মস্ত বড় বড় পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছে এবং চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাল হইয়া যায়, তখন পুনরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়– তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। নবী (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব লোকের শাস্তির দৃশ্য যাহাদের মাথা নামাযের জন্য উঠিতে চাহিবে না।

অতপর একদল নর-নারীকে দেখিলেন, যাহাদের সম্মুখ ও পিছনের লজ্জাস্থানে নেকড়া ঠাসিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহারা গরু-ছাগলের ন্যায় বিচরণ করিয়া দোযখের উদ্ভিজ্জ "জারী" ও "যাক্কুম" গাছ এবং কাঁকর ও পাথর ভক্ষণ করিতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের

দৃশ্য? তিনি বলিলেন, এই দৃশ্য ঐ লোকদের যাহারা স্বীয় ধন-সম্পত্তির যাকাত-সদকা আদায় না করিবে। এই শাস্তি তাহাদের সমুচিত শাস্তি, আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করেন নাই।

অতপর এক দল লোক দেখিলেন, তাহাদের সম্মুখে এক পাত্রে রান্না করা গোশ্‌ত অপর পাত্রে পচা দুর্গন্ধময় কাঁচা গোশ্‌ত রহিয়াছে– তাঁহারা প্রথমটি উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পাত্র হইতে খাইতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট বিবাহিতা হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হারাম ফাহেশা নারীর নিকট রাত্রি যাপন করিবে এবং ঐসব নারীর দৃশ্য, যাহাদের হালাল স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাহারা হারাম বদমাশ পুরুষদের নিকট রাত্রি যাপন করিবে।

অতপর পথের মধ্যে একটি কাষ্ঠবিশেষ বস্তু দেখিতে পাইলেন, সেই কাষ্ঠটি পথিকদের কাপড়-চোপড় জড়াইয়া ধরিয়া ফাড়িয়া ফেলে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা পথে বসিয়া থাকিয়া পথিকদের লুণ্ঠন করিবে।

অতপর এক লোককে দেখিলেন, সে লাকড়ির এক বিরাট বোঝা একত্রিত করিয়াছে যাহা উঠাইতে সে কোন প্রকারেই সক্ষম হইবে না, এতদসত্ত্বেও সে ঐ বোঝা আরও অধিক ভারী করিতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ লোকের দৃশ্য যাহার নিকট লোকদের বহু আমানত রহিয়াছে– যাহা আদায় করিতে সে সক্ষম নহে, কিন্তু সে আরও আমানত লাভের সুযোগ তালাশ করে।

অতপর দেখিলেন, এক দল লোকের জিহ্বা ও ঠোঁট কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে– তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, ইহা ভ্রষ্ট পথের প্রতি আহ্বানকারী বক্তাগণের দৃশ্য।

অতপর দেখিতে পাইলেন, একটি ছোট পাথর খণ্ড, তাহা হইতে বিরাট একটি বলদ বাহির হইল এবং পুনরায় সে তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সক্ষম হইতেছে না। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা ঐ লোকের দৃশ্য যাহার মুখ দিয়া কোন অসঙ্গত কথা বাহির হইয়া যায়, পরে সে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু ঐ কথা আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

তারপর একস্থানে পৌঁছিয়া অসাধারণ সুগন্ধময় শীতল বাতাসও কস্তুরীর খোশবু অনুভব করিলেন এবং মধুর সুরের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই আওয়াজ বেহেশতের। বেহেশত আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন নিবেদন করিতেছে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভিতর স্বর্ণ-চান্দি, আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাসের আসবাবপত্র অনেক অনেক জমা হইয়া আছে, এখন তাহার ব্যবহারকারী প্রদান সম্পর্কে তোমার যে আশ্বাস রহিয়াছে তাহা দান কর। আল্লাহ তাআলা তাহাকে উত্তর দিয়াছেন, মোমেন মোসলমান নারী-পুরুষ তোমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিলাম। তদুত্তরে বেহেশত বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

তারপর আর একস্থানে পৌঁছিয়া ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং ভীষণ দুর্গন্ধময় বাতাস অনুভব করিলেন। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের আওয়াজ। সে ফরিয়াদ করিতেছে– হে পরওয়ারদেগার! আযাব, কষ্ট ও দুঃখ-যাতনার সমুদয় জিনিষ আমার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে জমা হইয়াছে, এখন ঐ সবের শাস্তি ভোগের পাত্র আমাকে দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাহাকে বলিয়াছেন, কাফের-মোশরেক এবং কুকর্মী ও অহঙ্কারী নারী-পুরুষ, যাহারা হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে তোমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সে বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছিলেন কি?

এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরতের ছাহাবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশ্রেণীর আলেমের মধ্যেই মতভেদ

রহিয়াছে। মতভেদের কারণ এই যে, এই সম্পর্কে হাঁ না উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু প্রমাণ বিদ্যমান আছে এবং অকাট্য প্রমাণ কোন পক্ষেই নাই। সুতরাং পরবর্তী বিশিষ্ট এক শ্রেণীর আলেমের মত এই যে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ভ্রমণে ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ

এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিস্তারিত বিবরণ ও নির্ধারণ পাওয়া গেল না, শুধুমাত্র নিম্নে বর্ণিত দুইটি হাদীছই আমাদের খোঁজে পাওয়া গিয়াছে।

(১) শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মে'রাজ ভ্রমণের ঘটনা কিরূপ ছিল? তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিলেন–

صليت مع اصحابى صلاة العتمة بمكة معتما فاتانى جبرائيل بدابة ـ

অর্থ ঃ "আমি আমার সঙ্গী-সাথীগণের সঙ্গে একত্রেই রাত্রির পূর্ণ অন্ধকার সময়ের নামায (যাহা তখন পূর্ব আমলের কোন নিয়মে পড়া হইয়া থাকিত) মক্কা নগরীতেই পূর্ণ অন্ধকারে আদায় করিলাম। অতপর আমার নিকট জিব্রাঈলের আগমন হইল। (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) আমার সম্মুখে শ্বেত বর্ণের, গাধা অপেক্ষা বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট রকমের একটি বাহন উপস্থিত করিয়া আমাকে তাহার উপর আরোহণ করান হইল (বিস্তারিত বিবরণ দানের পর হযরত (সঃ) বলিয়াছেন)–

ثم اتيت اصحابى قبل الصبح بمكة فاتاني ابو بكر (رضى الله عنه) فقال يارسول الله اين كنت الليلة فقد التمستك فى مظانك ـ

অর্থ ঃ "তারপর আমি মক্কায় আমার সঙ্গী-সাথীগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি ভোর হওয়ার পূর্বেই।" তখন আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি ত আপনাকে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই তালাশ করিয়াছি। তখন হযরত (সঃ) বায়তুল মোকাদ্দাস যাওয়ার উল্লেখ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বায়তুল মোকাদ্দাস ত মক্কা হইতে এক মাসের পথের দূরত্বে অবস্থিত। (আবু বকর পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাস দেখিয়াছিলেন।) হযরত (সঃ) তাঁহাকে বায়তুল মোকাদ্দাসের মোটামুটি অনেক নিদর্শন বলিয়া দিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) নব উদ্যমে বলিয়া উঠিলেন, বাস্তবিকই আপনি আল্লাহর রসূল। (তফসীর ইবনে কাসীর, ৩+১৩–১৪)

(২) হযরতের চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী (রাঃ) মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, মে'রাজের ঘটনার রাত্রে হযরত (সঃ) আমারই গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। হযরত (সঃ) সন্ধ্যা রাত্রের পরের নামায আদায় করিয়া শুইয়া পড়িলেন, আমরাও শুইয়া পড়িলাম। প্রভাত হওয়ার পূর্বক্ষণে আমরা হযরতের সঙ্গে নিদ্রা হইতে উঠিলাম। প্রভাতের নামাযান্তে হযরত (সঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

لقد صليت معكم العشاء الاخرة كما رايت بهذا الوادى ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الان كما ترين ـ

অর্থ ঃ "আমি এই মক্কা নগরীতেই তোমাদের দৃষ্টির সমক্ষে এশার নামায আদায় করিয়াছিলাম, তারপর আমি বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইয়াছিলাম, তথায় মসজিদে আমি নামায পড়িয়াছি, তারপর এখন তোমাদের সঙ্গেই ফজরের নামায আদায় করিলাম। (তফসীর ইবনে, কাসীর, ৩–১২)

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় দৃষ্টে ইহা বলা অবাস্তব হইবে না যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনাটি রাত্রের এক সুদীর্ঘ অংশে সংঘটিত হইয়াছিল।

মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল

১৮০৭। হাদীছ ঃ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ) قَالَ هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ -

অর্থ ঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছেন, "আমি যেসব অলৌকিক দৃশ্য বস্তুনিচয় আপনাকে দেখাইয়াছি– একমাত্র লোকদের পরীক্ষার জন্য (তাহাদের নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি-না।)"

এই আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সমুদয় দৃশ্য ও বস্তুনিচয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করাই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূল (সঃ)-কে পরিদর্শন করানোর যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিদর্শন ছিল; উক্ত আয়াতে পরিদর্শনের কোন প্রকার রূপক অর্থ বা স্বপ্ন দেখার অর্থ উদ্দেশ্য নহে।)

যেই রাত্রে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পরিদর্শন করানোর ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচাত ভাই, যাঁহার পক্ষে স্বয়ং হযরত (সঃ) কোরআনের জ্ঞান ও দ্বীনের বুঝের জন্য বিশেষরূপে দোয়া করিয়াছিলেন– সেই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বিষয়টি খোলাসারূপে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করার ঘটনা। কোন প্রকারে শুধু আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন দেখার ঘটনা নহে। পূর্বাপর বিশ্ব মুসলিম জমাতের ঈমান এবং আকীদা বিশ্বাসও ইহাই, যুক্তি প্রমাণে এই দাবীই গ্রহণীয়। কারণ–

(১) হযরতের পিতৃব্য-কন্যা "উম্মে হানী" যাঁহার গৃহে হযরত (সঃ) মে'রাজের রাত্রে অবস্থানরত ছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এই যে, হযরত (সঃ) মে'রাজের রাত্রে আমার গৃহে শায়িত ছিলেন। পরে আমি দেখিতে পাইলাম হযরত (সঃ) গৃহে নাই, ফলে আমার নিদ্রা দূর হইয়া গেল। আমি চিন্তিত হইলাম যে, শত্রু দলের লোকেরা কোন কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে না কি। (রাত্র প্রভাতে নামাযান্তে) হযরত (সঃ) নিজেই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, রাত্রি বেলা জিব্রাঈল আসিয়া আমাকে গৃহ হইতে বাহির করেন এবং বোরাকে আরোহণ করাইয়া বায়তুল মোকাদ্দাসে লইয়া যান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনা যদি আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন হইত তবে গৃহ হইতে অন্তর্হিত হওয়ার অর্থ কি?

(২) শাদ্দাদ ইবনে আওস বর্ণিত হাদীছে আছে, মে'রাজের রাত্রে ভোর বেলা আবু বকর (রাঃ) হযরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! রাত্রি বেলা কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন? সম্ভাব্য সকল স্থানেই আপনাকে তালাশ করিয়াছি। তদুত্তরে হযরত (সঃ) মে'রাজের ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

(তফসীর ইবনে কাসীর, ৩–১৪)

সশরীরে মে'রাজ না হইয়া থাকিলে হযরত (সঃ) রাত্রে নিখোঁজ হইলেন কিরূপে?

(৩) হযরত (সঃ) ভোর বেলা উক্ত ঘটনা সর্বসাধারণ্যে ব্যক্ত করিলেন এবং লোকদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গেল। হযরতের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইবার এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার জন্য কাফেররা

এই ঘটনাকে বিশেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিল। এমনকি কোন কোন নবদীক্ষিত দুর্বল বিশ্বাসের মুসলমান এই ঘটনা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কাফেরদের প্ররোচনায় ইসলাম হইতে সরিয়া পড়িল।

মে'রাজ ভ্রমণের বাস্তবতাই যদি হযরতের দাবী না হইত, তবে ঐরূপ আলোড়ন সৃষ্টির হেতু কি থাকিতে পারে? স্বপ্নে ত সাধারণ মানুষের পক্ষেও ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে, সুতরাং সব রকম আলোড়ন ও দ্বিধাবোধের অবসান করার জন্য হযরতের পক্ষে শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট ছিল যে, ঘটনা বাস্তব জাতীয় নহে, স্বপ্ন জাতীয়। ঐরূপ বলা হয় নাই, বরং বাস্তব ঘটনারূপে প্রমাণ করারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৪) ১৮০৭ হাদীছের মর্মে দেখা যায়, ঘটনার এক বিশেষ অংশ বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন সম্পর্কে হযরত (সঃ) কাফেরদের পক্ষ হইতে পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; যদ্দরুন হযরত (সঃ) বিশেষভাবে বিব্রতও হইয়াছিলেন। অবশেষে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত (সঃ) উক্ত পরীক্ষায় স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

ঘটনা স্বপ্ন হইলে পরীক্ষার প্রশ্নই উঠিত না এবং হযরতের বিব্রত হওয়ারও কোন কারণ ছিল না। ঘটনাকে স্বপ্ন বলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর অবসান হইয়া যাইত।

মে'রাজের প্রতিরূপ বা স্বরূপ প্রদর্শন

১৮০৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ১১২০) عن شريك قال سمعت انس بن مالك يَقُوْلُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ انَّهُ جَاءَهُ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُّوْحٰى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً اُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ كَذَالِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا يَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ حَتّٰى احْتَمَلُوْهُ فَوَضَعُوْهُ بِئْرِ زَمْزَمَ ..... فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

অর্থ ঃ ছাহাবী আনাছ (রাঃ) কা'বা গৃহের নিকট হইতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রাত্রি ভ্রমণের ব্যাপারে একটি বিবরণ ইহাও প্রদান করিয়াছেন যে, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা– হযরত (সঃ) হরম শরীফের মসজিদে (অন্যান্য লোকদের সঙ্গে) নিদ্রিত ছিলেন। এমতাবস্থায় (তিনি দেখিলেন,) তাঁহার নিকট তিন জন লোক আসিল। তাহাদের প্রথম ব্যক্তি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলন, ইহাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি, উনিই তিনি। তখন তৃতীয় জন বলিল, সর্বোত্তম ব্যক্তিকে উঠাইয়া লও।

এই রাত্রির ঘটনা এতটুকু হইল– ইহার পর উক্ত আগন্তুকগণকে হযরত আর দেখিতে পাইলেন না; অবশ্য আর এক রাত্রে তাহারা পুনরায় আসিল। ঐ সময়ও হযরতের চক্ষুদ্বয় নিদ্রিত ছিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর নিদ্রিত ছিল না– অনুভূতি শক্তি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিল। নবীগণের নিদ্রাবস্থা এইরূপই যে, চক্ষু নিদ্রমগ্ন হয়, অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না।

এই রাত্রে আগন্তুকগণ আসিয়া কোন কথাবার্তা না বলিয়াই হযরত (সঃ)-কে বহন করিয়া জম্‌জম্ কূপের নিকট লইয়া আসিলেন। (১৮০০ নং হাদীছে বর্ণিত অনুরূপ আকাশ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের দৃশ্য দেখার পর বলা হইয়াছে–) অতপর হযরতের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি হরম শরীফের মসজিদেই ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত (সঃ) ওহী মারফত প্রত্যক্ষভাবে জিব্রাঈল ফেরেশতার উপস্থিতি

দ্বারা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে খবর খবর প্রাপ্ত হইতেন। নবুয়তের পূর্বে সেই ওহীরই প্রতিরূপ বা স্বরূপ আকারে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে সত্য স্বপ্ন দেখান হইত যাহা দিবালোকের ন্যায় বাস্তবায়িত হইয়া থাকিত। নবুয়তের নিকটবর্তী ছয় মাসকাল ঐরূপ স্বপ্নের খুব আধিক্য হইয়াছিল যাহার উল্লেখ প্রথম খণ্ডে ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

তদ্রূপ মে'রাজের ন্যায় বিশেষ অলৌকিক ও অতি অসাধারণ, বরং মানুষের ধ্যান, খেয়াল ও ধারণা বহির্ভূত ঘটনা, যাহা হযরতের পক্ষে বাস্তবায়িত হওয়ার ছিল, ঐ ঘটনারও অবিকল প্রতিরূপ হযরত (সঃ)-কে নবুয়তের পূর্বে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উল্লিখিত হাদীছে সে স্বপ্নের মাধ্যমে মে'রাজের বর্ণনা হইয়াছে যাহা ভিন্ন ঘটনা, পক্ষান্তরে বাস্তব মে'রাজ ভিন্ন ঘটনা।

অনেক ধোকাবাজ লোক সর্বসাধারণকে এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মে'রাজ শরীফ স্বপ্নের ঘটনা ছিল মাত্র, বাস্তব ঘটনা ছিল না। সেই ধোকাবাজগণ উল্লিখিত হাদীছখানা দ্বারা নিজেদের দাবী প্রমাণ করিতে চাহে। তাহাদের বুঝা উচিত যে, বাস্তব মে'রাজের কোন সম্পর্ক এই হাদীছের সঙ্গে মোটেই নাই। কারণ, বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে এই হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, قبل ان يوحى اليه অর্থাৎ এই ঘটনা হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা, অথচ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ত সমস্ত ঐতিহাসিক মোফাস্‌সের মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্ত, বরং বিশ্ব মুসলিমের আক্বীদা ইহাই যে, তাহা হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তির পরের ঘটনা। অতএব উভয় ঘটনা যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী আনাছ (রাঃ), তিনিই বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ১৮০১ এবং ১৯০২ নং হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছদ্বয়ে এমন কোন একটি অক্ষরও নাই যাহার দ্বারা মে'রাজ স্বপ্নে হওয়ার পক্ষে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, আলোচ্য হাদীছ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে নহে।

আলোচ্য হাদীছখানা যে বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কীয় মোটেই নহে, সে সম্বন্ধে ইমাম বোখারী (রঃ) সম্পূর্ণ একমত! তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায় যে, "ইস্‌রা ও মে'রাজ" নামে বোখারী (রঃ) বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে দুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদদ্বয়ের মধ্যে আলোচ্য হাদীছখানার কোন উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় মূল গ্রন্থের সমাপ্তির নিকটবর্তী যাইয়া অন্য এক প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীছখানা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুধু ধোকা ভঞ্জনের উদ্দেশে এই স্থানে উক্ত হাদীছখানার আলোচনায় সঠিক মর্ম উদঘাটনে বাধ্য হইয়াছ।

মে'রাজের মূল ঘটনা বাস্তব হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(১) শাদ্দাদ ইবনে আওস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রেওয়ায়াতে এই বিষয়টিও উল্লেখ আছে যে, মোশরেকগণ মূল ঘটনর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলে পর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি তাহার সত্যতার একটি প্রমাণ এই যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের পথে তোমাদের একটি সওদাগরী কাফেলার নিকট দিয়া অমুক স্থানে আমি পথ অতিক্রম করিয়াছি। তথায় তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল, অমুক ব্যক্তি সেই উটটি তাহাদের নিকট আনিয়া দিয়াছে। তাহারা (সেই পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে, সেই অনুপাতে) অমুক অমুক মঞ্জিল হইয়া অমুক দিন তাহারা মক্কায় পৌঁছিবে। কাফেলার সম্মুখ ভাগে গোধূম বর্ণের একটি উট রহিয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে কাল রংয়ের কম্বল বিছান এবং কাল রংয়েরই দুইটি বস্তা রহিয়াছে।

নির্ধারিত দিনে সেই কাফেররা মক্কায় পৌঁছিল এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত দেখা গেল।

(২) ১ম খণ্ড ৬ নং হাদীছ যাহার মধ্যে রোম সম্রাট হেরাকলের প্রতি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপি প্রেরণ এবং আবু সফিয়ান ও হেরাকলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে; সেই হাদীছেরই এক রেওয়ায়াতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, মিথ্যাবাদী নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার ভয়ে রোম সম্রাটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে রসূলুল্লাহর মর্যাদাহানিমূলক কোন উক্তি করার সুযোগ না পাইয়া আমি তাঁহার রাত্রি ভ্রমণের কাহিনীটি রোম সম্রাটের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। আমি বলিলাম, বাদশাহ নামদার! আমি নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির এমন একটি ঘটনা জ্ঞাত করিব যাহাকে অবশ্যই আপনি মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।

রোম সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বলিলাম, তিনি এই দাবী করিয়াছেন যে, আমাদের দেশ মক্কা হইতে বাহির হইয়া এক রাত্রে এই শহরস্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে পৌঁছিয়াছিলেন এবং সেই রাত্রেই প্রভাত হওয়ার পূর্বে মক্কা নগরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই কথাবার্তার সময় বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রধান পোপ বা লাট পাদ্রী রোম সম্রাটের সন্নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, উক্ত রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আমিও জ্ঞাত আছি। রোম সম্রাট পোপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট সেই ঘটনার অবগতি কিরূপে? পোপ বলিলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করার দায়িত্ব আমার উপর; আমি নিদ্রার পূর্বে অবশ্যই দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া থাকি। আলোচ্য ঘটনার রাত্রিতে আমি মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করিতে লাগিলাম, সব দরজাই বন্ধ হইল, কিন্তু একটি দরজা কোন উপায়েই বন্ধ হইল না। এমনকি উপস্থিত লোকজনসহ মসজিদের সমস্ত খাদেমগণ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা-তদবীর করিয়াও হেলাইতে পারিল না, তাহা পাহাড়ের ন্যায় অটল মনে হইতেছিল। অতপর ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া আনা হইল, তাহারা সব কিছু দেখিয়া বলিল, দরজার উপর দিকের চৌকাঠটি নীচে নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাত্রি বেলা দরজা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। ভোরে দেখা যাইবে, এরূপ কেন হইল?

পোপ বলিলেন, দরজার উভয় কপাট খোলা রাখিয়াই আমি শয়ন কক্ষে চালিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর উক্ত দরজার নিকট উপস্থিত হইলাম (এবং দেখিলাম দরজাটি এখন স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাও) দেখিলাম যে, মসজিদের এক কোণে (লোহার কড়ার ন্যায় মধ্যভাগে ছিদ্রবিশিষ্ট যে একটি পাথর ছিল এবং তাহার সেই ছিদ্র বহু দিন হইতে বন্ধ ছিল; আজ সেই) পাথরের ছিদ্র খোলা রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে বাহন বাঁধার নিদর্শন রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে বলিলাম, গত রাত্রিতে এই দরজাটি আখেরী নবীর আগমন উপলক্ষেই খোলা থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই নবী রাত্রে আসিয়াছিলেন এবং এই মসজিদে নামায পড়িয়া গিয়াছেন। *

(খাসায়েসে কোবরা। ১-১৭০ এবং তফসীর ইবনে কাসীর, ৩-২৩)

মে'রাজের সম্ভাব্যতা ঃ মে'রাজ শরীফ সম্পর্কে দুইটি প্রশ্নই বিশেষ জটিল বোধ হইয়া থাকে ঃ (১) সুদীর্ঘ ভ্রমণ, যাহার জন্য হাজার হাজার বৎসর আবশ্যক, কারণ এক হাদীছের বর্ণনাদৃষ্টে প্রত্যেকটি আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় এক হাজার বৎসর আবশ্যক। * এই হিসাবে সাত আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় সাত হাজার বৎসর আবশ্যক। তার উর্ধ্বে মহান আরশ ইত্যাদি বহু কিছুর ভ্রমণ মে'রাজের ঘটনায় হইয়াছিল,

---

* পোপের এই মন্তব্য আসমানী কিতাব সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতানুসারেই ছিল, কারণ পূর্বকালে নবীগণ এই বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া নিজ নিজ বাহন উক্ত ছিদ্রবিশিষ্ট পাথরের সঙ্গেই বাঁধিয়া থাকিতেন। তাহা নবীগণের ব্যবহারের জন্যই ছিল এবং দীর্ঘ ছয় শত বৎসর হইতে অব্যবহৃত থাকায় তাহার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শেষ যমানার নবীর মে'রাজ সম্পর্কেও আসমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ ছিল।

* পথ চলার সাধরণ নিয়মের পরিমাণ দৈনিক ১৬/১৭ মাইল হিসাবে এই নির্ধারণ অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রতিটি আকাশ এবং দুই আকাশের ব্যবধানের এই হিসাব।

এমনকি হযরত (সঃ) এই ঘটনায় তিন লক্ষ বৎসরের পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়।(তফসীর রহুল মাআ'নী, ১৫-১১)

এত বড় সুদীর্ঘ ভ্রমণ শুধু এক রাত্রে, বরং তাহার এক অংশে কিরূপে হইতে পারে?

(২) মহাশূন্যে বায়ুহীন অগ্নি ইত্যাদির যেসব স্তর বা মণ্ডল বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐসব অতিক্রম করা শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল এবং রক্ত-মাংসে গঠিত জীব মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

পাঠকবর্গ! এই ধরনের যত প্রশ্নই সম্মুখে আসুক, সবের খণ্ডন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় একটি শব্দের মাধ্যমে প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন- سبحان الذى اسرى "অতি মহান (সর্বশক্তিমান" সর্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে) পাক-পবিত্র যিনি, তিনি এই ভ্রমণ করাইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বর্তমান রকেটের যুগে ঐ ধরনের প্রশ্ন ত একমাত্র হাস্যাস্পদই গণ্য হইতে পারে। কারণ মানুষ এইরূপ দ্রুতযান তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে যাহা ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল তথা প্রায় এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিতে পারে *।

আল্লাহ তাআলা ত বহু পূর্বেই এর চেয়ে কত অধিক দ্রুতগামী বস্তু তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত হিসাব অনুসারেই পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৮৪৪৬ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবী তাহার বার্ষিক গতিতে প্রতি ঘণ্টায় এগার বৎসরের অধিক কালের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। আলো এবং শব্দের গতি আরো অধিক। মহান আল্লাহ তাআলা যে আরও কত কত অধিক দ্রুত গতির বস্তু ও বাহন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতে পারেন তাহার অনুভূতি আমাদের ঈমানের উপর নির্ভর করে, হিসাবের আওতায় নাও আসিতে পারে। ولا يحيطون بشئ من عمله আল্লাহ তাআলার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীম পরিধি মানুষ হিসাবের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই ভ্রমণ উপলক্ষে যে বাহন প্রথমে ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহার নাম 'বোরাক' যাহা 'বারক' শব্দ হইতে গৃহীত; তাহার অর্থ বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের গতি যে কত দ্রুত তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আকাশে এবং ইলেকট্রিক তারে প্রত্যেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। উক্ত বাহনটির দ্রুত গতি বুঝাইবার জন্যই তাহার এই নামকরণ হইয়াছে। তাহার পরে আরও বিশিষ্ট বাহন ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া হাদীছে বর্ণনা আছে।

আল্লাহ তাআলার নগণ্য সৃষ্টি মানুষ আজ শূন্যে জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষে সেই মহাশূন্য জয় করা কোন প্রকারে জটিল হইতে পারে- এরূপ ধারণা পাগলের পক্ষেও সম্ভভ কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করা

মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল; সেই সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং নাসায়ী শরীফসহ অনেক হাদীছের কিতাবেই তাহা বিদ্যমান আছে। বোখারী শরীফে এই সম্পর্কে একাধিক হাদীছ উল্লেখ আছে। ১৮০০ নং হাদীছের বিবরণ অতি সুস্পষ্ট, বিস্তারিত এবং এই সম্পর্কে হেরফেরকারীদের সব রকরমের ধোঁকা ভঞ্জনে বিশেষ সহায়ক। কারণ,

---

* আমেরিকার গভর্নমেন্ট ২৯ জুলাই ১৯৬৪ ইং তারিখে চাঁদের ফটো লইবার জন্য ৮০৬ পাউণ্ড ওজনের "Ranger-7" নামের যেই মহাশূন্যযান চাঁদের দিকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল ছিল বলিয়া রয়টার ও এ, পি,পি, পরিবেশিত খবর ২৯ শে জুলাইর সমুদয় খবরের কাগজেই প্রকাশ হইয়াছিল। সম্মুখে আরও অনেক কিছু হইবে।

এই হাদীছ মূল বিষয়টিকে شق শাক্ক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, অর্থ বিদীর্ণ করা, যাহা একটি বাহ্যিক কার্য। সঙ্গে সঙ্গে এই হাদীছের বিবৃতিতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, স্বয়ং হযরত (সঃ) স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করতঃ বিদীর্ণ কার্য সমাধার সীমা নির্ধারিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ما بين هذه الى هذه এই স্থান হইতে এই স্থান পর্যন্ত। যাহার ব্যাখ্যায় পরম্পরা ঘটনা বর্ণনাকারী বা সাক্ষীগণ বলিয়াছেন– সিনার উপরিভাগ হইতে নাভির নিম্নদেশ পর্যন্ত। হযরত (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, তৎপর আমার হৃৎপিণ্ডটি বাহির করিয়া ধৌত করা হইয়াছিল। ১৮০১ নং হাদীছে এবং আরও অনেক হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, অতপর আমার বক্ষ জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে। তারপর হযরত নবী (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈমান ভরা একটি পাত্র আনা হইয়াছে যদ্দারা আমার হৃৎপিণ্ড ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮০১ নং হাদীছে আছে– ঈমান ও হেকমত ভরা একটি পাত্র আনিয়া আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তথ্যটির তাৎপর্য এই যে, স্বর্ণ পাত্রে করিয়া এমন কোন বস্তু আনা হইয়াছিল যাহা ঈমান ও হেকমত তথা পরিপক্ব জ্ঞানবর্ধক ছিল, যেমন নানা প্রকার টনিক বা ইনজেকশন বোতল ও শিশিতে করিয়া আনিয়া মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহার কোনটা দর্শনশক্তি বর্ধক, কোনটা শ্রবণশক্তি বর্ধক, কোনটা হৃদশক্তি বর্ধক হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঈমান ও হেকমতের উন্নতির ধাপ আল্লাহর দরবারে অসংখ্য রহিয়াছে, অতএব হযরতের পক্ষে তাহা বর্ধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

হযরত আরও বলিয়াছেন যে, অতপর হৃৎপিণ্ডটি তাহার নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'যোরকানী' নামক কিতাবে আছে, হযরতের সিনা মোবারক চাক বা বিদীর্ণ করিয়া অতপর সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম শরীফের হাদীছে ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরতের বক্ষ মোবারকে সেই সেলাইর নিদর্শন দেখিয়াছেন।

বর্তমান সার্জিক্যাল চিকিৎসা ব্যবস্থার অসাধারণ উন্নতির যুগে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধরনের সংশয় বা দ্বিধাবোধ যে মোটেই সঙ্গত হইবে না তাহা অতি সুস্পষ্ট।

"সিনা চাক্ বা বক্ষ বিদীর্ণ" হযরতের উপর বার বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(১) সর্বপ্রথম সিনা চাক করা হইয়াছিল বাল্যকালে চারি-পাঁচ বৎসর বয়সের সময়। তখন তিনি দুধমা হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে ছিলেন।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধ পান" আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই ঘটনার বর্ণনায় পাঁচখানা হাদীছ বর্ণিত আছে। (সীরাতে মোস্তফা, ১–৫৭)।

এই ঘটনার বিবরণে একটি তথ্য বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদ্বয় হযরতের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে জমাট রক্তের দুইটি টুকরা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহা শয়তানের অংশ।

সিনা চাক অস্বীকারকারীগণ ঘটনার এই অংশটুকুকে সম্বল করিয়া হযরতের মর্যাদাহানীর দোহাই দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাহাদের বোকামি। কারণ মানুষ হিসাবে হযরতের ভিতরে সৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য মানুষের ন্যায় সব কিছুই ছিল, যেমন তাঁহার ভিতরে মল-মূত্রের ন্যায় বস্তুর সঞ্চার হইত।

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শয়তানী কাজ তথা খেলাধুলা ও অপরাধপ্রবণতায় মাতিয়া উঠে; তাহার উৎস মূল হিসাবে পরীক্ষা ক্ষেত্র ইহজগতে পরীক্ষার্থী মানুষ জাতের মানবীয় দেহের অংশ হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ঐ ধরনের একটা বস্তু থাকে। মানুষ হিসাবে হযরতের হৃৎপিণ্ডেও তাহা থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। অবশ্য তিনি নবী হিসাবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, অঙ্কুরেই ঐ মূল উৎস নিপাত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধপান" আলোচনায় টীকার মধ্যে রহিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় বার দশ বৎসর বয়সে। (৩) তৃতীয় বার নবুয়তপ্রাপ্তির সময়। (৪) চতুর্থ বার মে'রাজের ভ্রমণ উপলক্ষে– যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে।

প্রথম বারের বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য তাহার বর্ণনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয় যে, الشباب شعبة من الجنون সকল প্রকার উন্মাদনার সময় হইল যৌবনকাল।" এই ভয়াবহ যৌবনই আবার সব রকম বল-শক্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস। যৌবনের এই দু'ধারী ঢেউ সংযত ও সুসংহত রাখার জন্য যৌবনের সূচনার পূর্বেই বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় বারের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট; ওহী এক অসাধারণ আভ্যন্তরীণ চাপের বস্তু (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য), ঐ চাপ সামলাইবার যোগ্য শক্তি-সামর্থ্য প্রদানই ছিল এই বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য। চতুর্থ বারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ত এই রকেট যুগে নিতান্তই সহজবোধ্য। মানব দেহ ঊর্ধ্ব জগতে বিচরণযোগ্য করার জন্য রকেট আরোহীদেরকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কত রকমে প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তাআলার অসাধারণ বিশেষ সৃষ্টি নূরের তাজাল্লীতে তুর পর্বত খান খান হইয়া গিয়াছিল পয়গম্বর মূসা (আঃ) চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে এই ভ্রমণে মহান সিদরাতুল মোন্‌তাহা ও মহান আরশের উপর উক্ত নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণ বেশী নূরের তাজাল্লী পূর্ণ চৈতন্য বজায় রাখিয়া পরিদর্শন করিতে হইবে এবং সেই নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা আরও কত ঊর্ধ্বের মহান মহান বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিতে হইবে। সেই শক্তি-সামর্থ্যের প্রস্তুতিও ত ভ্রমণ আরম্ভে সম্পন্ন করিতে হইবে। এ সবই ছিল চতুর্থ বার বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য।*

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী তাঁহার পরে কোন নবী হয় নাই কেয়ামত পর্যন্ত হইবেও না

১৮০৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এবং আমার পরবর্তী নবীগণের একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া রাখ– এক ব্যক্তি একের পর এক ইটের গাঁথুনি দ্বারা একটি সুদৃশ্য সুন্দর অট্টালিকা বা ঘর তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু তাহার এক কোণায় একখানা ইট রাখার স্থান খালি রাখিয়াছে। দর্শকগণ ঘরখানা দেখিয়া খুবই প্রশংসা করে, কিন্তু এই বলিয়া অনুতাপও প্রকাশ করিতে থাকে যে, এই স্থানে একখানা ইট রাখিয়া ঘরখানার সম্পূর্ণতা সাধন করা হইল না কেন! হযরত (সঃ) বলেন– فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

"আমি সেই অবশিষ্ট একখানা ইট; আমি সর্বশেষ নবী।"

ব্যাখ্যা ঃ সৃষ্টির সেরা মানব জাতির দ্বারা এক আল্লাহর প্রভুত্বের বিকাশ সাধন– যাহা সারা জাহান সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থাস্বরূপ আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রতিনিধি রসূল বা নবীগণের যে বহর প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই নবী বহরকে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সুদৃশ্য অট্টালিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তটি নবীগণের পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। নবীগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত নিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলে ঐক্য শৃঙ্খলে এইরূপ অবিচ্ছেদ্য ও মজবুতভাবে আবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা মোটেই ছিল না, বরং তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক ছিলেন, যেরূপ কোন একটি সুদৃশ্য সৌধ বা অট্টালিকা হাজার হাজার সংখ্যক বিচ্ছিন্ন ইট দ্বারা তৈয়ার হয়, কিন্তু ঐ ইটগুলি সকলে মিলিয়া একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনে এত দৃঢ়তররূপে একত্রিত হয় যে, অবশেষে এত এত সংখ্যার ইটগুলি সৌধ বা অট্টালিকা তথা একটি বস্তুতে পরিণত হইয়া পড়ে।

---

* বহু সমালোচিত আকরম খাঁ মরহুম এইসব ঊর্ধ্বের বিষয়াবলী হইতে অজ্ঞ থাকায় বক্ষ বিদারণের মোজেযা অস্বীকার করিতে যাইয়া তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থে যেসব প্রলাপ করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। পাঠক উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্মুখে রাখিয়া খাঁ মরহুমের অসার প্রলাপগুলির খণ্ডন বুঝিয়া নিবেন; আশা করি বেগ পাইতে হইবে না।

অতএব, যেই ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র শেরক তথা এক আল্লাহর প্রভুত্বের বরখেলাফী থাকিবে তাহা সমস্ত নবীর তরীকার পরিপন্থী সাব্যস্ত হইবে, তাহাকে কোন নবীর তরীকা বা শরীয়তরূপে মনে করা বা দাবী করা অবাস্তব ও মিথ্যা হইবে। ধারাবাহিকরূপে নবীগণের আগমন অব্যাহত থাকিয়া সর্বশেষ নবী আগমনের পূর্বে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরকাল নবী আগমন বন্ধ থাকা এবং সুদীর্ঘ সময় সেই অবশিষ্ট সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে, অট্টালিকা নির্মাতা ধারাবাহিকরূপে ইটের গাঁথুনি দ্বারা সুদৃশ্য অট্টালিকা তৈয়ার করিয়াছে, শুধু একখানা ইটের স্থান খালি রহিয়াছে, দর্শকগণ সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়ার কামনা ও প্রতীক্ষায় রহিয়াছে!

অবশিষ্ট সর্বশেষ নবী যে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-ই ছিলেন– দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইবার জন্য হযরত (সঃ) বলিতেছেন যে, ঐ অট্টালিকায় একটিমাত্র ইটের শূন্যস্থান পূরণকারী ইটখানা হইলাম আমি।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর নবুয়তের সৌধ মধ্যে কাহারও প্রবেশের অবকাশই যে রহিল না, নবীগণের সারিতে দাঁড়াইতে পারে এমন আর কেহই যে বাকী থাকিল না, এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বীয় উম্মতকে প্রতারণার হাত হইতে রক্ষাকল্পে দৃষ্টান্ত দান শেষে হযরত (সঃ) বলিলেন, انا خاتم النبيين আমি সর্বশেষ নবী।"

বোখারী শরীফ ৫০১ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীছ পূর্বে অনূদিত হইয়াছে; উক্ত হাদীছখানা বোখারী শরীফ ৭২৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ

لِيْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَيَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ ـ

অর্থ ঃ হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমার বিশেষ পাঁচটি নাম আছে– "আমার নাম মুহাম্মদ, আহমদ এবং মাহী'– নিশ্চিহ্নকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফুরীর মূল উৎপাটন করিবেন এবং আমার নাম হাশের– একত্রকারী; সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে আমার পিছনে একত্রিত করা হইবে এবং আমার নাম "আ'কেব"। (মুসলিম শরীফ ২–২৬১পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছে এই নামটির তাৎপর্য উল্লেখ আছে যে, والعاقب الذى ليس بعده 'আ'কেব অর্থ সকলের পিছনে আগমনকারী– আমি এমন নবী যেই নবীর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।)

১৮১০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৯১) আবু হযম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দীর্ঘ পাঁচ বছর আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর শিষ্যত্বে আমি রহিয়াছি। তাঁহাকে আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, হযরত নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্রাঈলদিগকে নবীগণ পরিচালিত করিতেন– যখন এক নবীর মৃত্যু হইত তখনই তাঁহার স্থলে আর এক নবীর আবির্ভাব হইত, কিন্তু তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না, অবশ্য আমার স্থলে খলীফা বা কার্য পরিচালনকারী দাঁড়াইবে।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সময়ের জন্য আপনি আমাদিগকে কি পরামর্শ দেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, প্রথমে যেব্যক্তিকে তোমরা খলীফা নির্বাচিত করিবে তাহার প্রতি সমর্থন বজায় রাখিয়া চলিবে, অতপর তাহার পরে যাহাকে নির্বাচিত করিবে তাহার প্রতি– এইভাবে পর পর নির্বাচিত খলিফাগণের হক আদায় করিয়া যাইবে। (তাহাদেরও সতর্ক থাকিতে হইবে) স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহাদের হইতে হিসাব লইবেন যে, তাহারা তোমাদের পরিচালন কার্য কিরূপ সমাধা করিয়াছিল।

১৮১১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৩) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তবুকের জেহাদে যাইবার কালে তাঁহার স্থলে আলী (রাঃ)-কে মদীনার শাসনভার দিয়া রাখিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আলী (রাঃ) জেহাদে যাওয়ার প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন, তাই তিনি মনঃক্ষুণ্নরূপে বলিলেন, আমাকে আপনি

(জেহাদে অক্ষম) শিশু ও নারীদের দলভুক্তরূপে ছাড়িয়া যাইতেছেন? তখন হযরত (সঃ) আলী (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দানে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসা (রাঃ) যেরূপ হারুন (রাঃ)-কে তাঁহার স্থানে বসাইয়া আল্লাহর আদেশে তুর পর্বতে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আমার স্থানে থাকিবে। অবশ্য (তুমি হারুন আলাইহিস সালামের ন্যায় নবুয়ত প্রাপ্ত হইবে না, কারণ) الا انه ليس نبى بعدى –"আমার পরে কেহ নবুয়ত পাইতে পারে না।"

১৮১২ হাদীছ ঃ (পৃঃ ১০৩৫) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নবুয়তের কোন অংশই বাকী নাই (যাহা কেহ লাভ করিতে পারে)। শুধু মোবাশশেরাত বাকী রহিয়াছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মোবাশশেরাত কি জিনিস? তিনি বলিলেন, তাহা হইল সুস্বপ্ন।

ব্যাখ্যা ঃ নবীর নিকট নবুয়ত সংশ্লিষ্ট অনেক বস্তুই থাকে, যেমন– ওহী, আসমানী কিতাব, মোজেযা ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বাধিক নিম্নের বস্তু হইল "সুস্বপ্ন"।

বোখারী শরীফ ১০৩৬ ও ১০৩৯ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে–

رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة ـ

অর্থ ঃ "মোমেনগণের সুস্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ" তথা এই বস্তুটি নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের শ্রেণীভুক্তই বটে, কিন্তু নিম্নস্তরের এবং বহু দূর সম্পর্কীয়। কোন হাদীছে ইহাকে সত্তর ভাগের এক ভাগও বলা হইয়াছে। দূর সম্পর্কটা বুঝানই উভয় হাদীছের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই যে, নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের মধ্যে একমাত্র এই দূর সম্পর্কীয় বস্তুটিই বাকী রহিয়াছে যাহা মোমেনেরই লাভ হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন নবুয়তের আর কোন অংশ বাকী নাই যাহা কেহ লাভ করিতে পারে। সুতরাং অন্য কাহারও নবুয়ত লাভের কোন অবকাশই নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর ছিলেন, তাঁহার পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। এই সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছ কয়টি শুধু বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্ভিন্ন মুসলিম শরীফ ও সেহাহ্ সেত্তাহ্র অবশিষ্ট কিতাব এবং হাদীছ-তফসীরের অন্যান্য কিতাবে এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে যাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ইসলাম ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞ সকলেই একমত হইয়া স্পষ্ট ফতওয়া দিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর, তাঁহার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই এবং কেয়ামত পর্যন্ত হইবে না– এই আকীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস যদি কাহারও না থাকে এবং সে অন্য কাহাকেও নবীরূপে স্বীকার করে তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের গণ্য হইবে; তাহাকে অমুসলিম বিধর্মী গণ্য করা সকল মুসলমানের পক্ষে ফরয।

স্বয়ং হযরত (সঃ)ও এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন, যাহার কারণও তিনি এক হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটি বোখারী শরীফ ১০৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। হাদীছটি সুদীর্ঘ, তাহাতে এই অংশটুকু রহিয়াছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلٰثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে যাহারা পয়গম্বর হইবার দাবী করিবে; তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হইবে। এইসব প্রতারক হইতে সতর্ক করার উদ্দেশেই নবী (সঃ) এইরূপ ঘোষণা শুনাইয়া থাকিতেন, "আমি সর্বশেষ পয়গম্বর, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।"

রহমাতুল লিলআলামীন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি আপনাকে বিশ্ব কল্যাণ, বিশ্ব মঙ্গল ও সারা বিশ্বের জন্য করুণারূপে পাঠাইয়াছি।"

সারা জাহান আল্লাহর সৃষ্ট, নবীজীও আল্লাহর সৃষ্ট; সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই বলিয়াছেন– নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে তিনি সারা জাহানের জন্য মঙ্গল ও করুণারূপে পাঠাইয়াছেন। এই তথ্যের সৃষ্টিগত রহস্য নিশ্চয় কিছু রহিয়াছে এবং সেই রহস্যই বড় কারণ নবীজীকে রহমতুল লিল আলামীন আখ্যা দেওয়ার। এতদ্ভিন্ন নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেওয়া শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় যেসব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন হইয়াছে সেই সব শিক্ষা নীতি এবং আদর্শ কল্যাণের জন্য মহাদান। তাহার অনুসরণ অনুকরণে অমুসলিমরা জাগতিক কল্যাণ লাভে ধন্য হইতে পারে।

নবীজীর হাজার হাজার হাদীছের মধ্যে ঐসব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের বর্ণনা রহিয়াছে। নমুনাস্বরূপ আমরা ঐ সবের সামান্য আলোচনা করিতেছি।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থা দানে রহমতুল লিলআলামীন

১। নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মহান আদর্শ–

মঙ্গল ও কল্যাণময় শাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হইল মানুষের ত্রিবিধ নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ। সেই বিষয়ে নবীজীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল অতুলনীয়। তৎকালীন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ– বিদায় হজ্জে লক্ষাধিক মুসলমনের উপস্থিতিতে নীতি নির্ধারণী ভাষণে নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন– "মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত, এমনকি তাহার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত থাকিবে; পরস্পর কাহারও দ্বারা তাহার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হইতে পারিবে না।"– রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকিবে প্রতিটি মানুষের এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। সাম্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ–

পূর্বোল্লিখিত মৌলিক অধিকার ও নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগে এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচার লাভে সকলে সমান অধিকারী।

বিদায় হজ্জের সমাবেশেই নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন– সকল মানুষের আদি পিতা এক আদম; অতএব মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারে সকলে সমান পরিগণিত হইবে। আরবি এবং অ-আরবি, সাদা এবং কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য হইবে না।

আভিজাত্যের গর্বে নবীজীর নিজ বংশ কোরায়শ গোত্র সর্বাগ্রে ছিল। তাই মক্কা বিজয়ের ভাষণেও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অভিজাত-অনভিজাত, উচ্চ-নীচ ইত্যাদির ব্যবধানে যে বিচার পার্থক্য প্রচলিত ছিল তাহার উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়া বিচারে সকলকে সমান সাব্যস্ত করিয়াছিলেন (তৃতীয় খণ্ড মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)।

৩। সংখ্যালঘুর প্রতি অসীম উদারতা এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা ও নাগরিকত্বের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান–

নবী (সঃ) ঘোষণা দিয়াছেন– যেব্যক্তি কোন অমুসলিম অনুগত নাগরিককে অত্যাচার করিবে বা তাহার প্রাপ্য কম দিবে কিম্বা তাহার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিবে অথবা তাহার মন তুষ্টি ছাড়া তাহার কোন বস্তু হস্তগত করিবে; ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কেয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদী হইব।
(মেশকাত শরীফ, ৩৫৪)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, অমুসলিম অনুগত নাগরিককে যে মুসলমান হত্যা করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না। (বোখারী শরীফ ১০২১)।

৪। নিরাশ্রয়, অসহায়, এতিম বিধবা– নিঃস্বদের প্রতিপালনে রাষ্ট্রের উপর ব্যাপক দায়িত্ব অর্পণ। কথায় বা কলমে অর্পণই নহে শুধু, স্বয়ং নবীজী (সঃ) ঐ দায়িত্ব বহন করিয়াছেন এবং সকল রাষ্ট্রনায়কের উপর তাহা বর্তাইয়া গিয়াছেন।

যেব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিয়া বা পরিশোধের ব্যবস্থাও না রাখিয়া মরিয়া যাইত, প্রথম দিকে নবীজী (সঃ) তাহার জানাযার নামায নিজে পড়িতেন না। অতপর বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণে নবীজী মোস্তফা (সঃ) এক যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করিলেন, من ترك دينا اوضياعا فعلى যেকোন অসহায় ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদে ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধে অক্ষম অবস্থায় মরিয়া যাইবে কিম্বা নিরাশ্রয় এতিম বিধবা রাখিয়া যাইবে তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করা এবং এতিম বিধবার প্রতিপালন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আমার জিম্মায় থাকিবে। বায়তুল মাল সরকারী ধনভাণ্ডারের প্রথম ব্যয় বরাদ্দই ইহা । (বোখারী শরীফ)

৫। জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রনায়ক যে জনগণের শাসক হইয়াছে সে জনগণকে পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে; জনগণের সম্পর্কে সে দায়ী থাকিবে। (বোখারী)

৬। ক্ষমতাসীন হইয়া জনগণের প্রয়োজনের আড়ালে থাকিতে পারিবে না–

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান জনসাধারণের শাসনক্ষমতায় সমাসীন হইয়া যেব্যক্তি তাহাদের অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবেন (মেশকাত শরীফ, ৩২৪)

বোখারী শরীফে আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দারোয়ান ছিল না–

৭। শাসন পরিচালকদের ন্যায়নিষ্ঠা হইতে হইবে।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি দশজন লোকের উপর ক্ষমতাধিকারী ছিল তাহাকেও কেয়ামত দিবসে গলবদ্ধ শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থায় হাশর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। অতপর হয় তাহার ন্যায়পরায়ণতা তাহাকে মুক্ত করিবে, না হয় তাহার অত্যাচার-অবিচার তাহাকে ধ্বংসের নরকে পতিত করিবে। (মেশকাত ৩২১)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভকারী ভালবাসার পাত্র হইবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর সর্বাধিক গজবের পাত্র এবং আযাবে পতিত হইবে অত্যাচারী শাসক। (ঐ ৩২২)

৮। শাসকদের কর্তব্য জনগণের আস্থাভাজন ও প্রিয় হওয়া–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, উত্তম শাসক তাহারা যাহাদিগকে জনগণ ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে, তাহারাও জনগণকে ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে। আর নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত শাসক তাহারা যাহাদের প্রতি জনগণ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিশাপ করে, তাহারাও জনগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিশাপ করে। (মেশকাত শরীফ ৩১৯)।

৯। ক্ষমতায় থাকিয়া জনগণের কল্যাণ মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ক্ষমতাসীন হইয়া যেব্যক্তি জনগণকে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের সহিত প্রতিপালন না করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না। (বোখারী শরীফ)

১০। ক্ষমতা লাভ করিয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি শাসক হইয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরূপে মরিবে, আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। (মেশকাত শরীফ ৩২১)

১১। ক্ষমতা লাভ করিলে সতর্ক থাকিবে যেন জনগণের জীবন-মান সঙ্কীর্ণ না হয়–

নবী (সঃ) এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! যেব্যক্তি আমার উম্মতের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে, তুমি ঐ ব্যক্তির জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দাও। আর যেব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন যাপন সহজ করিয়া তোলে তুমি তাহার সব কিছু সহজ করিয়া দাও। (মেশকাত শরীফ, ৩২১)

কত শাসক নির্বাসিত বা কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য হয়। কত শাসক সবংশে ধ্বংস হইয়া যায়; জীবন সঙ্কীর্ণ হওয়ার পরিণাম ইহজগতে এই, পরকালে আরও যে কত সঙ্কীর্ণ হইবে!

১২। কোন শাসক বা আমলা সরকারী ধন অন্যায়ভাবে ব্যয় করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লাহর তথা জনগণের সরকারী মালের অন্যায় ব্যবহার করে; কেয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য নরক নির্ধারিত। (বোখারী শরীফ)।

১৩। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরও সরকারী ধন নির্ধারিত পরিমাণের বেশী ব্যয় করা হারাম।

১৪। শাসক প্রশাসকদের অবশ্যই সরল-সহজ, ভোগ-বিলাসবিহীন, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হইবে।

নবী (সঃ) ছাহাবী মোআয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশের গভর্নর পদে নিযুক্ত করিয়া বিদায়কালীন উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন– বিলাসিতার জীবন যাপন সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবে। আল্লাহ ভক্ত লোক বিলাসপ্রিয় হয় না। (মেশকাত শরীফ, ৪৪৯)

নবী (সঃ) মোআয (রাঃ)-কে ইয়ামনের গভর্নর মনোনীত করিলেন। তিনি যাত্রা করার পর নবী (সঃ) সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করাইলেন এবং বলিলেন, আমার অনুমতির বাহিরে কোন কিছু করিবে না। ঐরূপ ব্যয় খেয়ানত বা আত্মসাত গণ্য হইবে এবং কেয়ামত দিবসে ঐ খেয়ানতের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হাশর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সতর্কবাণীর জন্য প্রত্যাবর্তন করাইয়াছিলাম; এখন নিজ কার্যস্থলে যাত্রা কর। (মেশকাত শরীফ)

১৫। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও ব্যক্তিগত জীবনমানের উপরই চলিবে, নিজ অবস্থার ঊর্ধ্বে ভোগ-বিলাসে রাষ্ট্রের ধন ব্যয় করিবে না–

নবীজীর গোটা জীবনই উক্ত আদর্শের মহাগ্রন্থ ছিল। তাঁহার বাসস্থান খেজুর গাছের খুঁটীও আড়ায় তৈয়ার। ছিল। এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়াইলে বিবি আয়েশা (রাঃ) শায়িত অবস্থায় সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহার পা গুটাইলে নবী (সঃ) সেজদা করিতে পারিতেন। এতটুকু মাত্র উঁচু ছিল যে, ১২/১৪ বৎসরের বালকের হাত সেই ঘরের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছিত। দরজায় লোমের চট লটকানো ছিল। তাঁহার গৃহের উনুনে মাসেককাল পর্যন্ত আগুন জ্বলিত না; পরিবারবর্গ খেজুর ও পানির উপর জীবন যাপন করিতেন। যখন রুটি জুটত বেশীর ভাগ যবেরই হইত, গমের রুটি এবং গোশ্‌ত কমই হইত; পাতলা চাপাতি রুটি কখনও গৃহে তৈয়ার হইত না। কাপড়ে নিজ হাতে তালি লাগাইতেন, ছেঁড়া জুতা নিজ হাতে সেলাই করিতেন।

এইরূপে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের হাজার নজির নবীজীর জীবনে রহিয়াছে। অথচ নবীজী (সঃ) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তাঁহার হস্তে কত কত বিজয় লাভ হইয়াছে। লক্ষ কোটি টাকা সরকারী আয় তাঁহারই হাতে বণ্টিত ও ব্যয়িত হইয়াছে। সব তিনি জনগণের মধ্যে ব্যয় করিয়াছেন। ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং আদর্শাবলীর বদৌলতেই ৪ নম্বরে বর্ণিত যুগান্তকারী ঘোষণা ও বিধানটি বাস্তবায়িত করা শুধু সম্ভবই নয়, বরং সহজ হইয়াছিল। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাহারই অনুপাতে আমলাগণের মাথাভারী ব্যয়বহুল

প্রতিপালনে সরকারী ধনভাণ্ডার খালি হইয়া যায়, তাই ৪ নং বিধানের অবকাশ স্বপ্নে দেখাও ভাগ্যে জুটে না।

১৬। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও রাষ্ট্রীয় কার্যে সকলের সহিত কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া, সকলের সুখে-দুঃখে সমভাবে শরীক থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) খন্দকের জেহাদে মাসেককাল পর্যন্ত পরিখা খননে শরীক রহিয়াছেন। জরুরী অবস্থার ভয়াবহতায় অনাহারী থাকিতে হইয়াছে, ফলে কোমর শক্ত রাখার জন্য পেটে পাথর বাঁধিতে হইয়াছে; ছাহাবীগণ এক একটি পাথর বাঁধিয়াছেন, আর নবীজী (সঃ)-কে দুইটি পাথর বাঁধিতে হইয়াছে। জাবের (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীতে গোপনে দাওয়াত লাভ করিয়াছেন, কিন্তু একা না খাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া দাওয়াত খাইতে গিয়াছেন। (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে খন্দকের জেহাদ দ্রষ্টব্য।) রহমতুল লিলআলামীনের কিঞ্চিত মাত্র তাৎপর্য ইহা।

১৭। দেশ রক্ষায় বিপদসঙ্কুল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদান অগ্রভাগে থাকিতে হইবে।

একদা রাত্রি বেলা মদীনা শহরের নিকটে একটি ভীতিজনক শব্দ শ্রুত হইল। শহরের লোকজন ঘটনার অনুসন্ধানে যাইবে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণের শব্দ কিনা সেই ভয়ে তাহারা লোকজন জমা করিয়া যাত্রা করিল! এদিকে নবীজী (সঃ) ঐ শব্দ শুনার সঙ্গে সঙ্গে একাই তরবারি কাঁধে ঝুলাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সমগ্র শহরতলী এলাকা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সকলকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তোমাদের যাইতে হইবে না, আমি সর্বত্র দেখিয়া আসিয়াছি, ভয়ের কোন কারণ নাই।

ওহুদ এবং হোনায়ন রণাঙ্গনে নবীজীর ভূমিকা উন্নয়নকামী জাতির রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য সোনালী আদর্শরূপে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। (তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

১৮। রাষ্ট্রপ্রধান সর্বক্ষেত্রে প্রশাসক ও আমলাগণকে সততা, শান্তি ও ন্যায়ের জন্য তাগিদ করিবে। এমনকি যুদ্ধ-জেহাদের সামরিক অভিযান ক্ষেত্রেও–

নবী (সঃ) জেহাদ অভিযানে সৈন্য বাহিনীর বিদায় মুহূর্তে এই উপদেশ দিতেন– "আল্লাহর সাহায্য কামনা করিয়া আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ করিও। আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিও। কোন কিছু আত্মসাত করিও না, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নাক-কান কাটিয়া শত্রুকে যাতনা দিও না, শিশু হত্যা করিও না। (মেশকাত)

১৯। যুদ্ধের জরুরী অবস্থায়ও শান্তির জন্য এবং সত্য বুঝিবার সুযোগদানে শত্রুর প্রতি উদার থাকার আদর্শ ত্যাগ করিতে নাই। শত্রুর নিধন অপেক্ষা সংশোধনকে অগ্রগণ্য করিবে–

খায়বর যুদ্ধে প্রায় মাসেককাল ভীষণ যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার পর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য যখন আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্তে নবীজী (সঃ) পতাকা অর্পণ করিতেছিলেন, সেই মুহূর্তে আলী (রাঃ) দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দানে শত্রুর উপর দ্রুত ঝাঁপাইয়া পড়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে রহমতুল লিলআলামীন নবজী মোস্তফা (সঃ) আলী (রাঃ)-কে তাঁহার মনোভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, ধীরস্থিররূপে অগ্রসর হইবে, শত্রুর অবস্থানের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের নিকট ইসলাম পেশ করিবে। তাহা গ্রহণ না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণের প্রস্তাব করিবে। তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। তখনও স্মরণ রাখিবে– তোমার উসিলায় আল্লাহ তাআলা একটি মাত্র ব্যক্তিকেও সৎপথ দান করিলে তাহা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড ১৩৪৭ নং হাদীছে)।

২০। শান্তির খাতিরে শত্রুর সহিতও আপোষ মীমাংসায় চরম ধৈর্য ও পরম উদারতা অবলম্বন করিবে–

এই বিষয়ে নবীজী (সঃ) যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার নজির ইতিহাসে বিরল। হোদায়বিয়া সন্ধি উপলক্ষে বিরাট শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়াও নবীজী (সঃ) শত্রু পক্ষের অন্যায় জেদের সম্মুখে উদারতা ও

ধৈর্য-সহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন– যাহা শুধু শান্তির জন্য, আপোষের জন্য ছিল।

হিজরতের ছয় বৎসর পর যখন খন্দকের যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় শত্রু শিবির ধসিয়া পড়ার পথে ছিল এবং ইসলাম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, নবীজীর সঙ্গে প্রায় পনর শতের আত্মোৎসর্গকারী দল ছিল যাঁহাদের মাত্র তিন শতই বদর রণাঙ্গণে মক্কাবাসীদের চরমভাবে পরাজিত ও পর্যদুস্ত করিয়াছিল, নবীজীর সঙ্গে এত বড় শক্তি; তিনি ঐ পনর শত লোক লইয়া আল্লাহর ঘর যিয়ারত উদ্দেশে তিন শত মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতঃ মক্কার সন্নিকটে মাত্র নয় মাইল ব্যবধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন মক্কাবাসীরা এমতাবস্থায় আল্লাহর ঘর যিয়ারতে তাঁহাকে বাধা দিল– অগ্রসর হইতে দিবে না। এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে শান্তির নবী রহমতুল লিল আলামীন দৃঢ় কণ্ঠে শপথের সহিত ঘোষণা করিলেন– আল্লাহর স্মৃতিসমূহের সম্মান ক্ষুণ্ন না হয় এরূপ যেকোন শর্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব।

যেমন ঘোষণা তেমন কার্য– সন্ধিপত্র লিখিতে বিসমিল্লাহ লেখায়, "রসূলুল্লাহ" লেখায় আপত্তি; সব আপত্তিই মানিলেন! তিন শত মাইলের পরিশ্রম নিষ্ফল করিয়া আল্লাহর ঘর যিয়ারত ছাড়াই প্রত্যাবর্তনের শর্ত সহ আরও অনেক অবাঞ্ছিত শর্ত মানিয়া লইলেন, তবুও মক্কাবাসীদের সহিত দশ বৎসর মেয়াদের "যুদ্ধ নহে" শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে)।

২১। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য গড়িয়া তোলা ও বজায় রাখার আদর্শে সচেষ্ট থাকিবে–

বিদেশী প্রতিনিবৃন্দ এবং কূটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্যগণকে নবীজী (সঃ) সম্মান ও প্রীতির উপহার দিয়া থাকিতেন। এমনকি মৃত্যুশয্যায় নবী (সঃ) মুসলিম জাতিকে যেসব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও ছিল যে, "আমি যেরূপ বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে উপহার দিয়া থাকিতাম তোমরাও সেইরূপ উপহার দিও।

২২। ক্ষমতার সর্বোচ্চে থাকিয়াও নিজ ব্যাপারে ক্ষমার আদর্শ পালন করিবে–

এ বিষয়ে নবী (সঃ)-এর অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। একবার এক জেহাদের সফরে বিশ্রাম নেওয়ার অবস্থায় নবীজী (সঃ) সঙ্গীগণ হইতে ভিন্ন একা এক বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার তরবারি লটকাইয়া রাখিয়াছিলেন এক বেদুঈন কাফের এই সুযোগে নবীজীর তরবারিটি হস্তগত করিয়া নবীজীর উপর তাহা তুলিয়া ধরিল। এমতাবস্থায় নবীজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চোখ খুলিয়া তাঁহার উপর তরবারি ধরা দেখিতে পাইলেন। বেদুঈন হুঙ্কার মারিয়া নবীজী (সঃ)-কে প্রশ্ন করে, আপনাকে আমা হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? নবীজী (সঃ) গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আল্লাহ। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হস্তে কম্পন সৃষ্টি হইয়া বেদুঈনের হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। নবীজী (সঃ) তরবারি হাতে লইয়া ছাহাবীগণকে ডাকিলেন এবং বেদুঈনকে দেখাইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এত বড় ঘটনা, কিন্তু নবী (সঃ) বেদুঈনকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৮৭ নং হাদীছ)।

২৩। ক্ষমতার প্রতাপে অন্যায়-অত্যাচার কখনও করিবে না।

ইয়ামান দেশের গভর্নরূপে নবী (সঃ) মোআয (রাঃ)-কে নিয়োগ করিয়া বিদায়কালে উপদেশ দানে বলিলেন, কাহারও প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম করিয়া তাহার বদ দোয়ার পাত্র হইও না। মজলুমের বদ দোয়া সরাসরি আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছিয়া থাকে। (বোখারী শরীফ)

২৪। যুদ্ধর ক্ষেত্রেও মানুষকে বাঁচিবার যথাসাধ্য সুযোগ দিবে–

মক্কা বিজয়ের সময় শহর হইতে ১২/১৪ মাইল দূর রাত্রি যাপন করিয়া শহরে প্রবেশের জন্য যাত্রাকালে নবীজী (সঃ) তাঁহার দশ সহস্র সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন– আক্রান্ত না হইয়া আক্রমণ করিও না এবং নিরাপত্তার দ্বার অনেক সূত্রে খুলিয়া দিলেন। যথা– (১) যে অস্ত্র সমর্পণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (২) যে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৩) যে মসজিদে আশ্রয় লইবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৪) যে আবু সুফিয়ান সর্দারের গৃহে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। (তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)

২৫। বিজিতদের উপর বিগত আক্রোশে প্রতিহিংসা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে উদার নীতি গ্রহণ করিবে–

মক্কা বিজয়ের দিনই দীর্ঘ ২১ বৎসরে জালেম শত্রুদের প্রতি নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন– "তোমাদের কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ নাই; তোমরা মুক্ত।"

২৬। চরম বিজয়ী হইয়াও পরম বিনয়ী থাকার মহান আদর্শ পালন করিবে–

মক্কা বিজয় নবীজীর জন্য মহাবিজয় ছিল, এই ক্ষেত্রেও তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, শহরে প্রবেশ কালে তিনি নতশিরে প্রবেশ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহার নাক বাহনের পৃষ্ঠে ঘর্ষণ খাইতেছিল।

২৭। আইনের শাসন প্রয়োগে স্বজনপ্রীতির বিপরীত স্বজনদের উপর সর্বাগ্রে আইন প্রয়োগ করিতে হইবে

এই আদর্শে নবীজীর কার্যক্রম ছিল অতুলনীয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে অন্ধকার যুগের রীতি নীতির উচ্ছেদ এবং ইসলামী আইনের প্রবর্তন ঘোষণায় যখন তিনি বলিতেছিলেন– বংশ, গোত্র বা অঞ্চল হিসাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত ও বেআইনী হইল, হত্যাকারী ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইবে না; তখন দৃঢ়কণ্ঠে তিনি এই ঘোষণাও করিলেন, আমার বংশ কোরায়শদের একটি খুনের প্রতিশোধ প্রাপ্য রহিয়াছে বনু হোযায়েল গোত্রের উপর। ইসলামের আইন প্রয়োগে সর্বপ্রথম ঐ প্রতিশোধ গ্রহণ বাতিল ঘোষিত হইল।

তদ্রূপ সুদ বাতিল ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে নবীজী (সঃ) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, আমার পিতৃব্য আব্বাসের সুদী ব্যবসার সমুদয় সুদ সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত হইল (দ্বিতীয় খণ্ড বিদায় হজ্জের ভাষণ দ্রষ্টব্য)।

২৮। আইনের বিচারে আপন-পর সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, ন্যায়বিচারে আপনাদের বেলায় কঠোর থাকিতে হবে।

মক্কা বিজয়লগ্নে কোরায়শ বংশীয় এক রমণীর উপর চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হইল। ইসলামী আইনের বিচারে তাহার হাত কর্তনের ভয়ে কোরায়শগণ বিচলিত হইল; নবীজীর নিকট সুপারিশ পাঠাইল। সেই সুপারিশ প্রত্যাখ্যানে নবীজী (সঃ) জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন– মুহাম্মদ তনয়া ফাতেমার উপরও যদি চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হয়, খোদার কসম বিনা দ্বিধায় আমি তাহার হাত কাটিয়া দিব।

২৯। ভোট দান, মনোনয়ন দান ইত্যাদি রাজনৈতিক নির্বাচনে সমর্থন ব্যক্তিগত স্বার্থ, আশা ও লোভ লালসার ভিত্তিতে করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি শাসক নির্বাচনে ভোট বা সমর্থন দেয় নিজ স্বার্থের উদ্দেশে– তাহার স্বার্থ পূরণ করিলে সমর্থন বজায় রাখে, নতুবা সমর্থন প্রত্যাহার করে; এইরূপ ব্যক্তির উপর কেয়ামত দিবসে ভয়াবহ আযাব হইবে। আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি নেক দৃষ্টি করিবেন না; তাহার গোনাহ মাফ করিবেন না।

৩০। রাষ্ট্রের ও শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্যে সংহতি বজায় রাখিবে–

নবীজী (সঃ) মুসলমানদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন– নরমে-গরমে, আনন্দে, নিরানন্দে– সর্বাবস্থায়, এমনকি নিজের অপেক্ষা অন্যের অধিক সুযোগ সুবিধা দেখিয়াও রাষ্ট্রের অনুগত থাকিবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে না। সর্বক্ষেত্রে সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকিবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কাজে কাহারও নিন্দা-মন্দের পরোয়া করিবে না। (বোখারী শরীফ)

৩১। অন্যায় অত্যাচার ও নৈতিকতার বিপরীত– সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে রাষ্ট্রকেও জনগণ সমবেতভাবে বাধা দান করিবে।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর নাফরমানীর কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্য চলিবে না। রাষ্ট্রের আনুগত্য শুধু মাত্র বৈধ কার্যে। (বোখারী শরীফ)

৩২। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে নিজের না পছন্দ কোন কিছু দেখিলে ধৈর্য ধরিবে– সংহতি নষ্ট করিবে না। যেকোন ব্যক্তি সুসংহত ব্যবস্থা হইতে বিছিন্ন হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার জীবন অন্ধকার যুগের অনৈসলামিক জীবন হইবে। (মেশকাত শরীফ, ৩১৯)

৩৩। ক্ষমতাসীনদের অপকর্মে সমর্থন দিবে না; তাহা জঘন্য পাপ–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, পরবর্তী যুগে নানারকম শাসক হইবে, যাহারা সেই শাসকদের নৈকট্যের জন্য তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে, তাহাদের অন্যায়ের সমর্থন করিবে– ঐ শ্রেণীর লোক আমার উম্মত হইতে খারিজ। তাহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই; হাউজে কাওসারের পানি তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। (মেশকাত, ৩২২)

৩৪। শাসন ক্ষমতায় আসিবার জন্য নিজে উদ্যোগী হইবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, শাসন ক্ষমতা নিজে চাহিয়া লইও না, অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নিজের চেষ্টা ছাড়া তাহা তোমাকে অর্পণ করা হইলে তাহা পরিচালনায় আল্লাহর সাহায্য পাইবে। (বোখারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভে লালায়িত হইবে, কিন্তু কেয়ামত দিবসে তাহা বিষম অনুতাপের কারণ হইবে। এতদ্ভিন্ন শাসন ক্ষমতার আরম্ভ অতি মিষ্ট; কিন্তু তাহার পরিণাম অতি তিক্ত। (বোখারী শরীফ)

৩৫। শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য ছুটাছুটির প্রবণতা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে শাসন ক্ষমতাকে নিজের জন্য তিক্ত গণ্য করে; অবশ্য যদি তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। (বোখারী শরীফ)

৩৬। শাসকর্তাদের সম্বর্ধনা ও মানপত্রদান ইত্যাদি প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। (বাখারী শরীফ, পৃষ্ঠা– ১০৬৪)

৩৭। শাসনকর্তাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা চাই না– তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। (বোখারী শরীফ)

৩৮। আইন প্রয়োগ এবং শাসন পরিচালনায় কঠোরতা এড়াইয়া সহজ পন্থার এবং আইনের প্রতি জনগণকে বিতশ্রদ্ধ না করিয়া আকৃষ্ঠ করার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

নবী (সঃ) কাহারও উপর ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহাকে উপদেশ দিতেন, আইনের প্রতি লোকদেরকে আকৃষ্ঠ করিও তাহাদের মধ্যে ভয়-ভীতির নঞ্চার করিও না। সহজ পন্থার ব্যবস্থা করিও, কঠোরতা অবলম্বন করিও না। (বোখারী শরীফ)

৩৯। শুধু আইনের শাসন চালাইবে না, উপদেশদানে অধিক তৎপর থাকিবে।

নবী (সঃ) বাদী-বিবাদী উভয়কে সুস্পষ্ট ভাষায় উপদেশদানে বলিতেন, আমি তোমাদের বর্ণনা শুনিয়া বিচার করিব; হয়ত তোমাদের একজন অধিক বাকপটু (সে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়।) জানিয়া রাখিও বিবরণের উপর বিচারে অপরের হক্ব পাইয়া ফেলিলেও উহা তাহার জন্য দোযখের অগ্নি হইবে (ইহা কখনও ভোগ করিবে না।) বোখারী শরীফ)

৪০। শাসনকার্য পরিচালনায় প্রশাসকদের পরস্পর সহযোগিতা প্রয়োজন, বিভেদ সৃষ্টি করিবে না।

নবী (সঃ) ইয়ামান দেশের দুই অঞ্চলে বা দুই শাখায় দুই জন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বিদায়ী উপদেশে বলিয়া দিলেন– তোমরা পরস্পর সহযোগিতার সহিত কাজ করিবে, বিরোধ-বিভেদ সৃষ্টি করিবে না। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থার এইরূপ শত শত শিক্ষা ও আদর্শ নবী (সঃ) দান করিয়াছেন– যাহার অনুসরণে অমুসলিমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহা এড়াইয়া মুসলমানগণ অবনতির গহ্বরে পতিত হইয়াছে।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ ব্যবস্থা দানে রহমতুল লিল আলামীন

সুখ-শান্তির সমাজ, উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয় সমাজের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব, একতা ও শৃঙ্খলা, পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্য-সহায়তা। আরও প্রয়োজন হয় কনিষ্ঠদের উপর জ্যেষ্ঠদের প্রভাব, কনিষ্ঠদের প্রতি জ্যেষ্ঠদের স্নেহ মমতা এবং শ্রেণীগত বিভেদের মূল উচ্ছেদ। আর বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জ্ঞান বিস্তারের সুব্যবস্থা। সুতরাং সুখের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সমাজের লোকজনকে ঐসব গুণের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে নরমে-গরমে ঐসব গুণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে, ঐসব গুণে গুণান্বিতরূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পথে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যেসব শিক্ষা ও আদর্শ রহিয়াছে তাহা শুধু বিরলই নহে, বিশ্ব তাহা হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞও ছিল। নমুনাস্বরূপ আমরা তাঁহার ঐ শ্রেণীর শিক্ষা ও আদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করিতেছি।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– নবীজী (সঃ) কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে কখনও দুর্ব্যবহার করিতেন না, বরং কেহ দুর্ব্যবহার করিলে তাহা ক্ষমা করিতেন এবং অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, নিঃসহায় এবং এতীম বিধবাদের সহতায়তাকারী ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে আল্লাহর পথে জেহাদ করে বা সারা রাত্র নামায পড়ে, প্রতিদিন রোযা রাখে।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অপর মুসলমানের প্রয়োজন মিটাইবে। আল্লাহ তাহার প্রয়োজন মিটাইবেন। যেব্যক্তি অপর মুসলমানের একটি দুঃখ দূর করিবে, আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তাহার অনেক দুঃখ দূর করিবেন। যেব্যক্তি অপর মুসলমানের মান-ইজ্জত রক্ষা করিবে, আল্লাহ তাহার মান-ইজ্জত রক্ষা করিবেন। (বোখারী)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার হইতে ভালর আশা করা যায় এবং মন্দের ভীতি না থাকে, সেই উত্তম মানুষ। পক্ষান্তরে যাহার হইতে ভালর আশা না থাকে এবং মন্দের আশঙ্কা থাকে, সেই খারাপ মানুষ। (তিরমিযী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমানদের পরস্পর ছয়টি দাবী– (১) সাক্ষাতে সালাম করিবে, (২) আহ্বানে সাড়া দিবে, (৩) সাহায্যপ্রার্থীর উপকার করিবে, (৪) হাঁচি দিয়া আল্‌হামদু লিল্লাহ বলিলে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলিয়া দিবে, (৫) রোগে-শোকে খোঁজ খবর নিবে, (৬) মরিয়া গেল কাফন-দাফনে শরীক হইবে।(মুসলিম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) রুগীকে দেখিতে যাইতেন, জানাযার সঙ্গে গমন করিতেন, কোন দাস তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তাহাও গ্রহণ করিতেন।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, সদ্ব্যহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম সদ্ব্যবহার নয়; যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করার নামই সদ্ব্যবহার। (মেশকাত)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই; একে অন্যের প্রতি অন্যায় করিবে না, সাহায্য ছাড়িবে না, একে অন্যকে ঘৃণা করিবে না। (মুসলিম)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, দ্বীন-ইসলামের বড় কাজ হইল প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করা। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, জগদ্বাসীর প্রতি তুমি দয়ালু হও, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়ালু হইবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ না করিবে, জ্যেষ্ঠদেরকে শ্রদ্ধা না করিবে এবং সৎ কাজে আদেশ না করিবে, অন্যায় কাজে বাধা না দিবে, সে আমার উম্মত হইতে খারিজ। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আমার উম্মতের কোন লোককে খুশী করার জন্য তাহার প্রয়োজন মিটাইবে সে বস্তুতঃ আমাকে খুশি করিয়াছে; আর যে আমাকে খুশী করিয়াছে সে বস্তুতঃ আল্লাহকে খুশি করিয়াছে; যে আল্লাহকে খুশি করিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য তিহাত্তরটি মাগফেরাত লিখিয়া দিবেন; তাহার একটি দ্বারাই তাহার সব বিষয়ের শুদ্ধি ও সুষ্ঠুতা লাভ হইবে, আর বাহাত্তরটি দ্বারা কেয়ামত দিবসে উন্নতি লাভ হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহর আপনজন স্বরূপ। সুতরাং যে আল্লাহর বন্দাদের উপকার করিবে সে আল্লাহর প্রিয় হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, অন্যের দোষ খুঁজিও না, কাহারও নিন্দামন্দ করিও না, হিংসা করিও না, শত্রুতা বধাইও না, কাহারও দোষ চর্চা করিও না, দুনিয়া বাড়াইতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইও না, লোকদের সহিত ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করিবে। (বোখারী)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সমাজের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বজায় রাখিতে যত্নবান হওয়ার পূণ্য নামায রোযা ও দান-খয়রাতের পুণ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে পরস্পরের সম্পর্ক খারাপ হওয়া সুখ-শান্তি ও দ্বীন-ঈমান সব কিছুকেই বিদায় দেয়।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অন্যের ক্ষতি চাহিবে আল্লাহ তাহার ক্ষতি করিয়া দিবেন। যেব্যক্তি অন্যের জীবন সঙ্কীর্ণ করার চেষ্টা করিবে, আল্লাহ তাহার জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন মোমেনকে ধোকা দেয় বা তাহার ক্ষতি করে, তাহার প্রতি অভিশাপ। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মুসলমান ভ্রাতার দোষ খুঁজিয়া প্রকাশ করিবে আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিবেন এবং গৃহভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেও তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ঈর্ষা হইতে দূরে থাকিও; ঈর্ষা নেক আমল বরবাদ করিয়া দেয় যেরূপ অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া দেয়! –(আবু দাউদ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমলনামা আল্লাহর হুজুরে পেশ হয় এবং ঐ সময় অনেক বান্দারই গোনাহ মাফ হয়। কিন্তু যে দুই মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে বলা হয়, সদ্ভাবের প্রতি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহাদের জন্য ক্ষমা মুলতবী রাখ।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বেহেশত পাইবে না মোমেন না হইলে; মোমেন গণ্য হইবে না পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি না করিলে। আমি একটি কাজের পরামর্শ দেই, যাহা করিলে পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে– পরস্পর সালাম করার নীতি বেশী পরিমাণে প্রবর্তন কর। (মুসলিম শরীফ)

মাতৃজাতি সম্পর্কে রহমতুল লিল আলামীন

মাতৃজাতি সমাজের অর্ধাংশ এবং অর্ধাঙ্গিনী; তাহাদের প্রতি ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা এবং অন্যায়-অত্যাচার সমাজকে পঙ্গু করিয়া রাখিবে। অন্ধকার যুগে ত সমাজ নারীদের প্রতি এতই হিংস্র, নির্দয়

নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিল যে, মেয়ে সন্তানকে ভালবাসিত না কেহই; অনেকে তাহাকে জীবিত কবর দিয়া দিত। বর্তমান যুগ যাহাকে নারীদের রাজত্বের যুগ বলা যাইতে পারে– এই যুগে মেয়ে সন্তানের জন্মে অনেক কম লোকেরই আনন্দ হয়। ইহা কি নারীদের প্রতি বৈরীভাবের লক্ষণ নহে? নবীজী (সঃ) মেয়েদের প্রতিপালন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্তরে তাহাদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শ রাখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত কতিপয় নমুনা পেশ করা হইল।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি দুইটি মাত্র মেয়ের সুন্দররূপে ভরণ পোষণ ও প্রতিপালন করিবে সে বেহেশতে আমার এত নিকটবর্তী হইবে যেরূপ হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর নিকটবর্তী। (মুসলিম শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি তিনটি মেয়ে বা তিন জন ভগ্নীর প্রতিপালন ও শিক্ষাদান সুচারুরূপে করিবে– যাবত না তাহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা হয়; তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে। দুই জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া নবী (সঃ) বলিলেন, দুই জনের প্রতিপালনেও তাহাই। একজনের প্রতিপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল নবীজী (সঃ) তদুত্তরেও তাহাই বলিলেন। (মেশকাত শরীফ, ৪২৩)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার নিকট কোন মেয়ে থাকে এবং সে মেয়েকে তুচ্ছ না করে, ছেলেকে অগ্রগণ্য না করে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (আবু দাউদ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমার কোন মেয়ে স্বামী পরিত্যক্ত হইয়া নিরাশ্রয়রূপে তোমার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলে তাহার জন্য তুমি যাহা ব্যয় করিবে, তাহা তোমার জন্য সর্বাধিক উত্তম দান-খয়রাত গণ্য হইবে। (ইবনে মাজা শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতি সৃষ্টিগতভাবেই একটু বক্র স্বভাবের; পূর্ণ সোজা করিতে চাহিলে (সোজা না হইয়া) ভাঙ্গিয়া যাইবে তথা বিচ্ছেদের পাল্লায় আসিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে বাঁকা থাকিতে দিয়াই তাহার সহিত তোমার জীবিকানির্বাহ করিতে হইবে। তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ– তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম ও ভাল হইয়া থাকিবে। (মুসলিম শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, নারীগণ নামায রোযা, সতীত্ব রক্ষা ও স্বামীর আনুগত্য– এই সংক্ষিপ্ত আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিকট এত বড় মর্যাদা লাভ করিবে যে, বেহেশতের যেকোন শ্রেণীতে সে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করিবে। (মেশকাত, ২৮১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাহার সহধর্মিণীর সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। (তিরমিযী শরীফ)

একদা নবী (সঃ) কড়া নির্দেশ দিলেন, গৃহিণীদেরকে কেহ প্রহার করিতে পারিবে না। অতপর একদিন ওমর (রাঃ) নবীজীর নিকট প্রকাশ করিলেন, নারীগণ অত্যন্ত বেপরোয়া হইয়া গিয়াছে। সেমতে নবীজী (সঃ) (প্রয়োজন স্থলে সংযমের সহিত) প্রহারের অনুমতি দিলেন। এরপর বহু সংখ্যক মহিলা তাহাদের স্বামীদের অভিযোগ নিয়া নবীজীর গৃহে ভিড় জমাইল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কঠোর ভাষায় বলিলেন, অনেক মহিলা তাহাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে; ঐরূপ স্বামীগণ মোটেই ভাল মানুষ নহে। –(আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সহধমিণীর সহিত যে উত্তম জীবন যাপনকারী হয় সেই উত্তম মানুষ। আমি আমার সহধর্মিণীদের সহিত উত্তম জীবন যাপন করি। (তিরমিযী শরীফ)

সত্যই নবীজী (সঃ) সহধর্মিনীদের প্রতি অতি উত্তম ছিলেন। একবার সফর অবস্থায় বিবি সফিয়া রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য উটের উপর আরোহণ করা কঠিন হইলে নবী (সঃ) নিজ উরু পাতিয়া দিলেন। সফিয়া (রাঃ) সিঁড়ির ন্যায় নবীজীর উরু মোবারকের উপর পা রাখিয়া উটে আরোহণ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একবার নবীজী (সঃ) এতেকাফে ছিলেন; সফিয়া (রাঃ) নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিলেন; তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় নবী (সঃ) তাঁহাকে মর্যাদার সহিত বিদায় দানে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসিলেন।

আয়েশা (রাঃ) কম বয়স্কা ছিলেন। নবীজীর গৃহে নয় বৎসর বয়সে আসিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তাঁহার বাল্য বয়সের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল যাহাদের সঙ্গে আমি বাল্যসুলভ খেলাধুলা করিতাম। নবী (সঃ) গৃহে আসিলে তাহারা লুকাইয়া যাইত; নবী (সঃ) তাহাদিগকে তালাশ করিয়া আমার নিকট পাঠাইতেন। তাহারা পুনঃ আমার সহিত খেলা জুড়িত। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– একবার ঈদের আনন্দে খঞ্জর চালনার খেলা হইতেছিল। নবী (সঃ) আমাকে গৃহদ্বারে তাঁহার পিছনে দাঁড় করাইয়া তাঁহার কাঁধের ফাঁক দিয়া ঐ খেলা দেখাইলেন। খেলা দেখায় আমার মন ভরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন– খেলা দেখায় লালায়িত যুবতী কত দীর্ঘকাল দেখিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (সঃ) আমার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিলেন; তাহাতে আমি জয়ী হইলাম। অনেক দিন পর যখন আমার শরীর ভারী হইয়া গিয়াছিল তখন আর একদিন সেই প্রতিযোগিতা করিলে আমি পরাজিত হইলাম। নবীজী (সঃ) তখন কৌতুক করিয়া বলিলেন, আমার সেই পরাজয়ের বিনিময়ে তোমার এই পরাজয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নবীজী (সঃ)-এর কী মধুর সম্পর্ক ছিল সহধর্মিণীগণের সঙ্গে! নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সহিত সময়ে খোশগল্পও করিতেন। একদা নবীজী (সঃ) বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে এক সুদীর্ঘ খোশ-গল্প জুড়িয়া ছিলেন। হাদীছটি বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে– "হাদীছে উম্মে যারা" নামে। এক সময় আরবের একাদশ সংখ্যক সুসাহিত্যিক মহিলা একত্র হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনায় ভাষাজ্ঞানের বাহাদুরী দেখাইল। তন্মধ্যে উম্মে যারা নাম্নী মহিলা সুদীর্ঘ ও সুললিত ভাষায় নিজ স্বামীর সর্বাধিক বেশী প্রশংসা করিল। নবী (সঃ) আয়েশার নিকট সেই একাদশ মহিলার প্রসিদ্ধ গল্পটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আয়েশা! উম্মে যারার স্বামী তাহার জন্য যেরূপ ছিল, আমি তোমার জন্য সেরূপ।

নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিও নবীজী (সঃ) বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নবীজীর আমলে দ্বীন শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র নবীজীই ছিলেন; নবীজীর সব কথা বিশেষতঃ ভাষণসমূহ শরীয়তের বিশেষ বস্তু ছিল। তাই নবীজীর ভাষণ উপলক্ষে নর-নারী নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতির আদেশ ছিল। জুমা ও ঈদের নামাযে নবীজী (সঃ) বিশেষ ভাষণ দিতেন; সেই ভাষণ শুনিবার জন্য সকলেই উপস্থিত হইতেন। তবে নারীগণ সকলের পিছনে থাকিতেন। একবার ঈদের খোতবা সাধারণ নিয়মে প্রদানের পর নবীজী (সঃ) লক্ষ্য করিলেন, নারীদের পর্যন্ত তাঁহার কথা সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে নাই। তাই নবী (সঃ) বেলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া নারীদের অবস্থান স্থলে যাইয়া পুনঃ ভাষণ দিলেন। (বোখারী শরীফ)

আর একবারের ঘটনা– নারীগণ নবীজীর (সঃ) নিকট অভিযোগ করিল, নবীজীর মজলিসে তাহারা পুরুষদের ভিড়ের কারণে পূর্ণ উপকৃত হইতে পারে না; সেমতে তাহাদের অভিলাষ অনুযায়ী নবী (সঃ) তাহাদের জন্য ভিন্ন মজলিসের ব্যবস্থা করিলেন।

স্ত্রীদের প্রতি নবীজী (সঃ) কত অধিক সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাহাদের কত বেশী মর্যাদা তিনি দিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ বিদায় হজ্জের নীতি নির্ধারণী ঐতিহাসিক ভাষণে নারীদের মর্যাদা দানের কর্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন–

"নারীদের উপর স্বামীদের যেরূপ হক ও দাবী আছে, তদ্রূপ স্বামীদের উপর, স্ত্রীদেরও হক এবং দাবী আছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন– নারীদের সম্পর্কে আমার বিশেষ নির্দেশ পালন করিও, তাহাদের প্রতি

সদ্ব্যবহার ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর ব্যবস্থা বজায় রাখিও। .... তাহাদিগকে তোমরা লাভ করিয়াছ আল্লাহর আমানতরূপে এবং তাহাদের সতীত্ব ভোগ করিতে পারিয়াছ আল্লাহর বিধানের অধীনে। সেই আল্লাহর রসূল আমি, অতএব তাহাদের সম্পর্কে আমার নির্দেশ পালনে তোমরা বাধ্য।

একদা আবু বকর (রাঃ) নবীজীর (সঃ) গৃহে আসিতেছিলেন বাহির হইতে বিবি আয়েশা (রাঃ) উচ্চ স্বর শুনিতে পাইলেন– তিনি নবীজীর সহিত প্রতিউত্তর করিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ক্রোধভরে ঘরে আসিয়া আয়েশা (রাঃ)-কে এই বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন যে, এত বড় স্পর্ধা! রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আওয়াজের উর্ধ্বে তোমার আওয়াজ! আবু বকর (রাঃ) এই বলিয়া আয়েশা (রাঃ)-কে চড় মারিতে উদ্যত হইলে নবী (সঃ) আয়েশাকে আবু বকর হইতে আড়াল করিয়া রাখিলেন। আবু বকর (রাঃ) চলিয়া গেলে নবী (সঃ) আয়েশাকে বলিতে লাগিলেন, দেখিলে ত মিঞা সাহেব হইতে কত কষ্টে তোমাকে বাঁচাইয়াছি! (আবু দাউদ)

প্রতিবেশী সম্পর্কে নবীজী (সঃ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে সে বেহেশত পাইবে না। (মেশকাত শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, সেব্যক্তি মোমেন নহে যে পেট পুরিয়া খায়, অথচ তাহার নিকটবর্তী প্রতিবেশী অনাহারী রহিয়াছে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যে লোক তাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম পরিগণিত, সে আল্লাহর নিকটও উত্তম পরিগণিত। যেব্যক্তি নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম পরিগণিত, সে আল্লাহর নিকটও উত্তম পরিগণিত। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের প্রিয় হইতে চায় তাহার কর্তব্য হইবে সত্যবাদী হওয়া, বিশ্বাসভাজন হওয়া এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারকারী হওয়া। (মেশকাত শরীফ)

এতীম সম্পর্কে নবীজী (সঃ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তথা নিঃস্বার্থভাবে এতীমের মাথায় স্নেহের হস্ত বুলায় তাহার হস্ত স্পর্শিত প্রতিটি লোমের পরিবর্তে নেকী লাভ হইবে। যেব্যক্তি কোন এতীম বালক বা বালিকার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, সে বেহেশতের মধ্যে আমার অতি নিকটবর্তী হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতীমের লালন-পালনকারী ও আমি বেহেশতে এইরূপ নিকটবর্তী থাকিব, যেরূপ হাতের দুইটি আঙ্গুল। (বোখারী শরীফ)

দানশীলতায় নবীজী (সঃ)

নবীজী (সঃ) কোন সময় দানপ্রার্থীকে "না" বলিতেন না– তাঁহার এই উদার স্বভাব অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময় নবীজীর পরিধেয়ের প্রয়োজন ছিল। এমন সময় এক মহিলা নবীজীর জন্য সযত্নে হাতে বুনিয়া একটি চাদর পেশ করিল। প্রয়োজনের সময়ে তাহা পাইয়া নবী (সঃ) তাহা পরিধানে ছাহাবীগণের সমাবেশে আসিয়া বসিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর! চাদরখানা আমাকে দান করুন। নবী (সঃ) গৃহে যাইয়া পুরাতন চাদর পরিধানপূর্বক নূতন চাদরখানা ঐ ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ডে ৬৬৭ নং হাদীছে দ্রষ্টব্য।

এক ছাহাবী তাঁহার ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করিতে নবীজী (সঃ)-এর নিকট সাহায্য চাহিলে নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আয়েশার ঘরে এক ধামা আটা আছে, তাহা নিয়া যাও। ঐ ব্যক্তি তাহা নিয়া চলিয়া গেল, অথচ নবীজী (সঃ)-এর ঘরে তাহা ছাড়া আর কিছু ছিল না। (সীরাতুন নবী)

আতিথেয়তা

ইহা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক মহান আদর্শ। তিনি বলিয়াছেন, যাহার ঈমান আছে তাহার কর্তব্য মেহমানের সম্মান করা।

একদা নিরাশ্রয় লোকদের ভিড় জমিয়া গেল। নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিলেন, যাহার ঘরে দুই জনের আহার আছে, সে যেন তৃতীয় জনকে নিয়া যায়। যাহার ঘরে চারি জনের আহার আছে, সে যেন ষষ্ঠ জন পর্যন্ত সঙ্গে নিয়া যায়। আবু বকর (রাঃ) তিন জন মেহমান নিলেন, আর নবীজী তাঁহার গৃহে দশ জনকে নিলেন। (মুসলিম)

কোন নিরাশ্রয় আসিলে তাহার আতিথেতার জন্য প্রথমে নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে অবকাশের খোঁজ লইতেন। তাঁহার গৃহে একেবারেই কোন ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে অন্যদেরকে অনুরোধ করিতেন।

নিঃসহায়দের অন্যতম একজন ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। কাহারও নিকট খাদ্য চাহিতে লজ্জা হয়, তাই শুধু ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য ক্ষুধার্তকে অন্নদান সম্পর্কীয় কোরআনের আয়াতের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আর্ষণ করিতে লাগিলাম; এমনকি আবু বকর এবং ওমরকেও ঐরূপ করিলাম, কিন্তু কেহই আমার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। নবী (সঃ) ঐরূপ করিতে দেখিয়া আমার অবস্থা ঠাহর করিয়া ফেলিলেন এবং মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, আবু হোরায়রা! আমার সঙ্গে আস। গৃহে যাইয়া এক পেয়ালা দুগ্ধ পাইলেন, যাহা কেহ হাদিয়া দিয়া গিয়াছে। আদেশ হইল মসজিদের বারান্দায় নিরাশ্রয় সকলকে ডাকিয়া আন। প্রথমে সকলকে পান করাইতে বলিলেন, অতপর আমাকে পুনঃ পুনঃ তৃপ্তির অতিরিক্ত পান করাইলেন।

নবী (সঃ) অমুসলিমের আতিথেয়তায়ও কুণ্ঠিত হইতেন না। আবু বুসরা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি এক রাত্রে নবীজীর অতিথি হইয়াছিলাম! তাঁহার গৃহে যে কয়টি বকরী ছিল সবগুলির দুগ্ধ একা আমিই পান করিয়া শেষ করিলাম। নবী (সঃ) পরিবারপরিজন সহ ঐ রাত্র অনাহারেই কাটাইলেন; তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। (সীরাতুন নবী)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাতে এক কাফের ব্যক্তি নবীজীর অতিথি হইল। নবীজী তাহাকে ছাগীর দুধ দোহন করিয়া পান করাইতে লাগিলেন, সে পর পর সাতটি ছাগীর দুগ্ধ একাই পান করিয়া ফেলিল। নবীজী (সঃ) মোটেই বিরক্ত না হইয়া যত্নের সহিত তাহার সম্মুখে দুধ পরিবেশন করিয়া গেলেন। ঐ কাফের নবীজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ভোর হইতেই মুসলমান হইয়া গেল। এখন সে একটি ছাগীর দুধেই তৃপ্ত হইয়া গেল। (তিরমিযী শরীফ)

ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদে নবীজী সদা সচেষ্ট থাকিতেন। এব ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্য চাহিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কিছুই নাই কি? সে বলিল, শুধুমাত্র একটি কম্বল আর একটি পানি পানের পেয়ালা আছে। নবী (সঃ) তাহার সেই বস্তুদ্বয়ই আনাইলেন এবং দুই দেরহামে বিক্রি করিয়া বলিলেন, এক দেরহাম পরিবারের খরচের জন্য দিয়া আস, আর এক দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট নিয়া আস। নবী (সঃ) নিজেই ঐ কুড়ালে হাতল লাগাইয়া তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গল হইতে জ্বালানি

কাঠ কাটিয়া বিক্রি করিবে; পনর দিন যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই– এক ধারে ঐ কাজ করিয়া যাইবে। সে ব্যক্তি তাহাই করিল এবং অচিরেই দশ দেরহাম উপার্জন করিয়া কাপড় ক্রয় করিল, খাদ্য ক্রয় করিল। নবী (সঃ) তাহাকে বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য উত্তম হইয়াছে ইহা অপেক্ষা যে, তুমি ভিক্ষা করিতে এবং কেয়ামত দিবসে তোমার চেহারায় ভিক্ষাবৃত্তির নিশানা সর্বসমক্ষে ফুটিয়া উঠিত। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সম্বল থাকিতে যেব্যক্তি ভিক্ষা চাহিবে, হাশর মাঠে তাহার চেহারায় আঁচড় ও ক্ষত হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার সম্বল (এক দিনের আহার) আছে তাহার জন্য বা যাহার অঙ্গসমূহ সঠিক আছে তাহার জন্য ভিক্ষা চাওয়া হালাল নহে। –(তিরমিযী)

শ্রমের মর্যাদাদান

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাও এবং জ্বালানী কাঠের বোঝা পিঠের উপর বহন করিয়া বিক্রি কর; ইহা দ্বারা আল্লাহ তোমার মান-ইজ্জত রক্ষা করিবেন– ইহা ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য তাহার নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য নাই। (বোখারী শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের জন্য সর্বাধিক পাক-পবিত্র খাদ্য হইল তাহার নিজের উপার্জিত খাদ্য। (নাসারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করাও একটি ফরয। (মেশকাত)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন শ্রমিক দ্বারা কাজ করাইয়া শ্রমিকের পারিশ্রমিক পরিশোধ না করিবে, কেয়ামত দিবসে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহার বিরুদ্ধে বাদী হইবেন। (বোখারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মজদুর দ্বারা কাজ করাইলে মজদুরের ঘাম শুকাইবার পূর্বেই তাহার মজুরি আদায় করিয়া দাও। –(মেশকাত শরীফ)

স্বভাবগত সংসারী জীবনের শিক্ষাদান

স্বভাবের বিপরীত বৈরাগ্য ও সন্যাস জীবনের প্রতি নবীজীর দৃঢ় অনীহা ছিল। তিনি সব সময়ই সংসারী জীবনের আদর্শ স্থাপন ও শিক্ষা দান করিয়াছেন।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ইসলামে সন্যাস জীবনের স্থান নাই। বিশিষ্ট ছাহাবী ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) সন্যাস জীবনের অনুভূতি চাহিলে নবী (সঃ) দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা তিন জন ছাহাবী তিন রকম প্রতিজ্ঞা করিলেন। একজন বলিলেন, আমি রাত্রে কখনও নিদ্রা যাইব না– সারা রাত্র নামায পড়িয়া কাটাইব। অপরজন বলিলেন, সারা জীবন রোযা রাখিব। আর একজন বলিলেন, সারা জীবন বৈরাগী হইয়া থাকিব– বিবাহ করিব না। নবী (সঃ) তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে শপথের সহিত বলিলেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে সর্বাধিক ভয় করি, তথাপি রাত্রে ঘুমাই, রোযাবিহীনও থাকি, বিবাহও করিয়াছি। আমার এই তরীকা হইতে যে বিরাগী হইবে সে আমার জমাত হইতে খারিজ গণ্য হইবে। (বোখারী শরীফ)

অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আদর্শ

শ্রমিক, মজুর, ভৃত্যদের প্রতি নিজে ত নবীজী (সঃ) দয়াবান ছিলেনই, বিশেষভাবে ইহার আদর্শ শিক্ষা

দানেও নবীজী (সঃ) বিশেষ তৎপর থকিতেন।

একজন ছাহাবী তাঁহার দাসের প্রতি কঠোরতা করিলে নবী (সঃ) তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, তুমি তাহার প্রতি যতটুকু ক্ষমতা রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা রাখেন। (বোখারী শরীফ)

বিশিষ্ট ছাহাবী আবু যর (রাঃ) তাঁহার বৃত্যকে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলে নবীজী তাঁহাকে কঠোর ভাষায় বলিলেন, তোমার মধ্যে অন্ধকার যুগের অসভ্যতা রহিয়াছে। এই ভৃত্যগণ তোমাদেরই ভ্রাতা; আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়াছেন। তোমাদের কর্তব্য অধীনস্থদের নিজেদের ন্যায় যত্নের সহিত খাওয়ানো-পরানো। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, ভৃত্য তোমার জন্য খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিলে তোমার কর্তব্য সেই খাদ্যের এক গ্রাস তাহাকেও প্রদান করা। এই খাদ্য তৈয়ার করিতে সে অগ্নি তাপ সহ্য করিয়াছে এবং নানা কষ্ট করিয়াছে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমার দাসকে তাহার সাধ্যের অধিক কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিও না। যদি সেইরূপ কষ্টের কাজ তাহার দ্বারা করাইতেই হয় তবে তোমার কর্তব্য হইবে তাহাকে সাহায্য করা। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা
শিক্ষাদানে রহমতুল লিলআলামীন

পারিবারিক জীবন কল্যাণময় ও মঙ্গলময় করিতে হইলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। সে সম্পর্কের উন্নতির জন্য নবীজীর দেওয়া আদর্শ ও শিক্ষা অতুলনীয়। সেইসব আদর্শ ও শিক্ষার অনুসরণে সহজেই একটা সুখী পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে।

একদা নবীজী (সঃ) তিন বার বলিলেন, সে লাঞ্ছিত হউক। জিজ্ঞাসা করা হইল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যেব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে বা তাঁহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়া তাহাদের খেদমত করিয়া বেহেশতের অধিকারী হইতে পারে নাই। (মুসলিম শরীফ)

আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মা পৌত্তলিক থাকাবস্থায় মদীনায় আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি আমার এই মাতার খেদমত করিব কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তাঁহার খেদমত করিবে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি; আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী শরীফ)

এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার মাতা-পিতা এন্তেকাল করিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কিছু বাকী আছে কি? নবী (সঃ) বলিয়াছেন, হাঁ– তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে, মাগফেরাত চাহিবে, তাঁহাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরা করিবে, তাঁহাদের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের খেদমত করিবে, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের শ্রদ্ধা করিবে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কোন হতভাগার মাতা-পিতা যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় মরিয়া যায় তবে সে যদি আজীবন তাহাদের জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আল্লাহ তাআলা মাতা-পিতার সন্তুষ্টিভাজন গণ্য করিয়া নিবেন। –(মেশকাত শরীফ, ৪২১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দাবী ঐ পরিমাণ, যে পরিমাণ মাতা-পিতার দাবী সন্তানের উপর। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যাহার সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করে, সাধারণতঃ তাহার স্বভাব চরিত্র ও মতবাদ অবলম্বনকারী হইয়া পড়ে। অতএব লক্ষ্য করা চাই, কিরূপ ব্যক্তির সহিত ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করা হইতেছে। (মেশকাত শরীফ, ৪২৭)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মোলায়েম ব্যবহার অবলম্বন কর; তাহা সুনাম-সুখ্যতি বর্ধক। কঠোরতা ও লজ্জাহীনতা পরিহার কর; তাহা কুখ্যাতির কারণ। (মুসলিম শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র বড় পুণ্য। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা মোমেন ব্যক্তি সমস্ত দিন রোযা ও সারা রাত্র নামাযের পুণ্য লাভ করিতে পারে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত মোমেন সরল ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে ধোঁকাবাজ ও অসভ্যতা ফাসেক হওয়ার পরিচয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, লজ্জা-শরম দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য। (মেশকাত শরীফ, ৪৩২)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশে বিনম্র হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে ছোট মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে মহান গণ্য হইবে। আর যেব্যক্তি অহঙ্কার করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে হেয় ও নিচ করিয়া দিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে বড় মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে এত ছোট হইবে যে, শূকর-কুকুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত হইবে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মুখ সংযত রাখিবে আল্লাহ তাআলা তাহার ইজ্জতের হেফাজত করিবেন। যেব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাহাকে আযাবমুক্ত রাখিবেন। যেব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামত দিবসে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির সওয়াব লইয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ লাগাইয়াছে, কাহারও ধন আত্মসাত করিয়াছে, কাহাকেও খুন করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে ঐ সব দাবীদারকে তাহার সমুদয় নেক বা সওয়াব বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দাবীদার শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহার নেক বা সওয়াব শেষ হইয়া গিয়াছে; ফলে অবশিষ্ট দাবীদারদের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপানো হইয়াছে– পরিণামে তাহাকে দোযখে ফেলা হইয়াছে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি নিজের পরকাল বিনষ্ট করিয়াছে অন্যের ইহকাল ভাল করার জন্য সে কেয়ামত দিবসে সর্বাধিক মন্দ ও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হইবে। (ঐ)

যত লোক জায়েয না যায়েয চিন্তা না করিয়া নামায-রোযার খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া, নিজের পরকালের উন্নতি বিধান না করিয়া দুনিয়ায় সম্পদের উপর সম্পদ, ধনের উপর ধন বাড়াইতে থাকে সে শ্রেণীর সব লোক উক্ত হাদীছের লক্ষ্য। কারণ, অতিরিক্ত ধন-সম্পদসমূহ ত সবই অন্যের; চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক ওয়ারিসগণ হইয়া যাইবে। অথচ এই সব ধন-সম্পদ উপার্জনে নিজের দ্বীন-ঈমান বিনষ্ট ও পরকালের জীবন ধ্বংস করা হইয়াছিল।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার বেশী অনুরাগী যে হইবে তাহাকে আখেরাতের ক্ষতি করিতে হইবে; আর যে আখেরাতের বেশী অনুরাগী হইতে চাহিবে তাহাকে দুনিয়ার কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। তোমারা চিরস্থায়ী আখেরাতকে অগ্রগণ্য কর ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপর। অর্থাৎ আখেরাতেরই অনুরাগী হও যদিও দুনিয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। (মেশকাত শরীফ, ৪৪১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে তোমার অপেক্ষা উচ্চ এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য গেলে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে তোমার অপেক্ষা নিম্ন। (জাগতিক ব্যাপারে) সদা তোমার অপেক্ষা নিম্নদের

প্রতি দৃষ্টি রাখিও, উচ্চদের প্রতি দৃষ্টি দিও না; তাহা হইলে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগুজারী সহজ হইবে। (ঐ)

পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠুতার তাগিদ

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ছাহাবীর অতিরিক্ত রোযা, অতিরিক্ত তাহাজ্জুদ নামাযের চর্চা হইলে নবীজী তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনিলেন, এমনকি একবার স্বয়ং তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহাকে ঐরূপ না করার কড়া নির্দেশ দিয়া বলিলেন– তোমার উপর তোমার জানের হক রহিয়াছে, চোখের হক রহিয়াছে, স্ত্রীর হক রহিয়াছে, এমনকি সাক্ষাত প্রার্থীরও হক রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সব হক তোমাকে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে; অতিরিক্ত নফল এবাদতে মগ্ন হইয়া ঐ সব হক্ ক্ষুণ্ন করা চলিবে না। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০২৯ নং হাদীছে দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগত জীবনে রহমতুল লিলআলামীন

"নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী।" (আল কোরআন)

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা– নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ের ও, কথা বার্তায় অত্যন্ত সত্যবাদী এবং, অধিক কোমল স্বভাবের ছিলেন। প্রথম দর্শনে দর্শকের উপর তাঁহার ঐশী প্রভাব পতিত হইত, কিন্তু তাঁহার সাহচর্যে ও মেলামেশায় মানুষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইত। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইত– তাঁহার পূর্বে বা পরে তাঁহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। (তিরমিযী শরীফ)

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ)-এর বর্ণনা– যোহর নামায পড়িয়া আমি নবীজীর সঙ্গে চলিলাম, তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। কচিকাঁচারা তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; তিনি প্রত্যেককে তাহার গণ্ডদ্বয় ধরিয়া স্নেহ দেখাইতেছিলেন। স্নেহভরে আমার গণ্ডদ্বয়ও স্পর্শ করিলেন; তাঁহার হস্ত মোবারক সুশীতল ছিল এবং এরূপ সুগন্ধময় ছিল, যেন তাহা এখনই আতরের ডিবা হইতে বাহির হইয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা নবীজী (সঃ)-কে অনুরোধ করা হইল মোশরেকদের প্রতি বদ দোয়া করার জন্য। তিনি বলিলেন, আমি বদ দোয়ার জন্য আসি নাই; আমি ত রহমত ও মঙ্গলরূপে আসিয়াছি। (মুসলিম শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী (সঃ)-এর সহিত কেহ মোসাফাহা– করমর্দন করিলে অপর ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি হাত ছাড়িতেন না। ঐ ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার পূর্বে তিনি মুখ ফিরাইতেন না। (তিরমিযী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ফজর নামায হইতে অবসর হওয়ার পর মদীনার গৃহ-ভৃত্যরা পানি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। (পানি তাঁহার দ্বারা বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য)। নবী (সঃ) তাহাদের প্রত্যেকের পানিতে হাত ডুবাইতেন। এমনকি প্রবল শীতের সময়ও নবীজী (সঃ) তাহাদের পানিতে হাত ডুবাইয়া থাকিতেন। (মুসলিম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একমাত্র জেহাদ ছাড়া নবীজী (সঃ) কাহাকেও কোন সময় প্রহার করেন নাই– এমনকি খাদেম, ভৃত্য বা কোন স্ত্রীকেও নয়। (ঐ)

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী পণ্ডিত নবীজীর (সঃ) নিকট কিছু টাকা পাওনা ছিল। সে একদা ঐ টাকার তাগাদায় আসিল; ঐ সময় নবীজীর (সঃ) হাতে টাকা ছিল না, তাই তখন পরিশোধে

অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী পণ্ডিত বলিল, টাকা উসুল না করিয়া আমি যাইব না আপনাকে ছাড়িব না। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আচ্ছা– টাকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার হইতে দূরে কোথাও যাইব না। সেমতে নবীজী (সঃ) দুপুর বেলা হইতে এশার নামায পর্যন্ত ঐ ইহুদী পণ্ডিতের ধারে ধারেই থাকিলেন। এমনকি রাত্রেও সে তথায়ই থাকিল এবং নবীজী (সঃ)ও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও গেলেন না। এই অবস্থায় ফজর নামায পড়া হইলে ছাহাবীগণ ঐ ইহুদীকে ভীতি প্রদর্শন এবং চটাচটি আরম্ভ করিলেন। নবীজী (সঃ) তাহা টের পাইয়া ছাহাবীগণকে বাধা দিলে তাঁহারা বলিলেন, এই ইহুদী আপনাকে এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? তদুত্তরে নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে নিষেধ করিয়াছেন কাহারও প্রতি, এমনকি কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতিও অন্যায় করিতে।

বেলা একটু বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল এবং তাহার সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিল; সে অনেক বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাম্‌সা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী (সঃ) নবী হওয়ার পূর্বের ঘটনা– নবীজীর (সঃ) সহিত আমার একটি লেনদেন হইল এবং লেনদেনের কিছু অংশ বাকী থাকিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অবশিষ্ট প্রাপ্য আমি নিয়া আসিতেছি, এস্থানেই তাহা আপনাকে অর্পণ করিব। তিনি তথায় অপেক্ষমাণ থাকিলেন যেন আমি আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া বিব্রত না হই। ঘটনাক্রমে আমি তথায় ফিরিয়া আসিবার কথা ভুলিয়া গেলাম। তিন দিন পর হঠাৎ আমার ঐ কথা স্মরণ হইল; আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নবীজী (সঃ) তথায় আমার জন্য অপেক্ষমাণ আছেন। আমাকে তিনি শুধু এতটুকু বলিলেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তিন দিন যাবত আমাকে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে (তুমি আমাকে না পাইয়া বিব্রত হও না কি)! –(আবু দাউদ শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক দল ইহুদী নবীজীর (সঃ) নিকট আসিয়া সালাম করার স্বরে আস্‌সালামু আলাইকুমের স্থলে আস্‌সামু আলাইকুম বলিল, যাহার অর্থ আপনার মৃত্যু হউক। নবীজী (সঃ) তাহাদিগকে "অলাইকুম– তোমাদের উপর" বলিয়া উত্তির দিলেন; আর কিছুই বলিলেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি (রাগ সামলাইতে না পারিয়া পর্দার ভিতরে থাকিয়াই) বলিলাম, তোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লাহর অভিশাপ ও আল্লাহর গজব। নবী (সঃ) আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখ আয়েশা! সব কাজেই নম্রতাকে আল্লাহ ভালবাসেন। আমি বলিলাম, আপনি শুনিলেন না তাহারা কি বলিল? নবী (সঃ) বলিলেন, আমি শুনিয়াছি এবং "ওয়া আলাইকুম– তোমাদের উপর" বলিয়া দিয়াছি। দেখ আয়েশা! সদা নম্রতা অবলম্বনে যত্নবান থাকিও; কুবাক্য, কটূক্তি কঠোরতা পরিহার করিয়া চলিও আল্লাহ তাআলা কুবাক্য কটূক্তি ভালবাসেন না। (মুসলিম শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি নবীজীর মসজিদে আসিয়া হঠাৎ মসজিদের ভিতরেই এক জায়গায় প্রস্রাব করিতে লাগিল। ছাহাবীগণ তাহার প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিলে নবীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না। (হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ করায় রোগের আশঙ্কা থাকে।) অতপর ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া নবী (সঃ) তাঁহার নিকটে আনিলেন। ঐ ব্যক্তির নিজের বর্ণনা কসম খোদার! নবী (সঃ) আমাকে একটুও ধমকাইলেন না, কোন প্রকার কঠোরতা দেখাইলেন না। তিনি মোলায়েমভাবে আমাকে বুঝাইলেন, মসজিদ আল্লাহর এবাদতের ঘর, মল-মূত্র ইত্যাদি অপবিত্র ও ঘৃণার বস্তুর স্থান ইহা নহে। অতপর ঐ স্থানে পানি বহাইয়া দিলেন। (মুসলিম শরীফ)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবীজীর (সঃ) নিকট তাহার প্রাপ্যের তাগাদায় আসিল এবং কঠোর ভাষায় কথা বলিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাহাকে মন্দ বলিও না; পাওনাদারের বলার অধিকার থাকে। (বোখারী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবীজীর সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। নবীজীর (সঃ) গায়ে

একখানা চাদর ছিল যাহার পাড় মোটা শক্ত ও পুরু। হঠাৎ এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া নবীজী (সঃ)-কে ঐ চাদরে জড়াইয়া অতি জোরে টান দিল এবং বলিল, জনসাধারণকে দেওয়ার যে মাল আপনার হাতে রহিয়াছে তাহা হইতে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাহা টানের চোটে নবীজীর (সঃ) গলিবার উপর চাদর পাড়ের রেখা পড়িয়া গেল। নবীজী (সঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া হাসিলেন এবং তাহাকে মাল দেওয়ার আদেশ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাইর পুত্র ছিল "আদী"। তাহারা ছিল খৃস্টান; তাহাদের গোত্র প্রভাব প্রতাপশালী ছিল, "আদী" ছিল গোত্রপতি। মুসলমানগণ তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলে আদী সপরিবারে পলায়ন করিয়া সিরিয়া চলিয়া যায়। তাহার এক বৃদ্ধা ভগ্নী ছিল, সে বান্দিনীরূপে মদীনায় উপনীত হইলে নবীজীর (সঃ) করুণা ভিক্ষা চাহে। নবীজী (সঃ) তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে শুধু মুক্তিই দিলেন না, বরং তাহার ভ্রাতার নিকট সিরিয়ায় পৌঁছিবার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে যাইয়া ভ্রাতা আদীকে নবীজীর (সঃ) অসাধারণ অমায়িকতার কথা শুনাইলে আদী নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সদলবলে মদীনা যাত্রা করিলেন। (বিস্তারিত বিবরণ হিজরী নবম বৎসরের বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।)

উক্ত আদীর বর্ণনা– সর্বত্র বিজয়ের অধিকারী মুসলিম জাতির প্রধান– মদীনার রাষ্ট্রপতি নবী সম্পর্কে তিনি নানা ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। তিনি মদীনায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ভক্ত-অনুরক্তগণের পরিবেশে নবীজী বসিয়া আছেন। এমন সময় একজন অতি সাধারণ মহিলা আসিয়া নবীজীকে অনুরোধ করিল– দরবার হইতে উঠিয়া গোপনে তাহার কিছু কথা শুনিবার জন্য। তাহার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে নবীজী তাহার সহিত দূরে গেলেন এবং পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহিলাটির কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবীজী পরম ধৈর্যের সাথে তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিলেন। হাতেম পুত্র আদী বলেন, বিনয় উদারতার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ রসূল। (সীরাতুন নবী)

নবীজীকে কেহ হাদিয়া-উপঢৌকন দিলে নবীজী তাহার প্রতিদান দিতেন। অন্যক্যে ও এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। "জাহের" নামীয় এক গ্রাম্য ছাহাবী গ্রাম্য বস্তু নবীজীর জন্য নিয়া আসিতেন; নবীজী তাঁহাকে শহরী বস্তু দানে বিদায় করিতেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতেন– জাহের আমাদের গ্রাম, আমরা তাহার শহর।

নবীজী (সঃ) অপরিসীম অমায়িক ও মধুরতাপ্রিয় ছিলেন, তাই তিনি ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীদের সহিত কৌতুক-পরিহাসও করিতেন। উল্লিখিত ছাহাবী জাহের (রাঃ)-কে নবী মুহাম্মদ (সঃ) ভালবাসিতেন, তিনি ছিলেন অসুন্দর আকৃতির। একদা তিনি বাজারে বসিয়া কোন জিনিস বিক্রি করিতেছিলেন। নবীজী তাঁহার পিছন দিক হইতে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, তিনি পিছন দিকে তাকাইতে পারিতেছিলেন না। প্রথমে তিনি নবীজীর (সঃ) কথা ভাবিতেও পারেন নাই; অন্য লোক ভাবিয়া বলিলেন, কে আপনি? আমাকে ছাড়িয়া দিন। অতপর নবীজী (সঃ)-কে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং যথাসম্ভব নিজের পিঠ নবীজীর বক্ষের সহিত সাধ্যমতে ঘেঁষিয়া রাখিতে যত্নবান হইলেন। নবীজী (সঃ) ঐ অবস্থায় কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই দাসীটি কে খরিদ করিবে? তখন ঐ ছাহাবী নিজের অসুন্দর আকৃতির ইঙ্গিতে বলিলেন, আমাকে বিক্রি করিতে চাহিলে অচল পাইবেন। নবী (সঃ) বলিলেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট অচল নও। (মেশকাত শরীফ, ৪১৭)

নবী (সঃ) কাহারও অসুস্থতার সংবাদ পাইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। এমনকি প্রতিবেশী অমুসলিমকেও রোগ শয্যায় দেখিতে গিয়াছেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কপালে ও হাতের শিরায় হাত রাখিতেন এবং আশ্বস্ত করিতে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন– কোন ভয় নাই, কষ্টের বিনিময়ে গোনাহ মাফ হইবে। এতদ্ভিন্ন রোগীর শরীরে বা যাতনা স্থানে হাত বুলাইয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন।

দয়ার দরিয়া নবীজী (সঃ)

দয়া ছিল নবীজীর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি দয়া প্রদর্শনে যে ভূমিকা পালন করিতেন তাহাই তাঁহার রহমতুল লিলআলামীন হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে অতিশয় দয়ালু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

শত্রুর প্রতি দয়া

মানব চরিত্রে সর্বাধিক দুর্লভ বস্তু হইল শত্রুর প্রতি উদারতা, দয়া ও ক্ষমা। কিন্তু নবীজীর চরিত্র ভাণ্ডারে ঐ দুর্লভ বস্তুর অভাব ছিল না; তিনি শত্রুর প্রতিও অযাচিত অনুগ্রহ এবং উদারতা, ক্ষমা প্রদর্শনে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় আলোচনায় পরম শত্রু মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হোবার ইবনে আসওয়াদ নামক মক্কার এক মহাদুষ্কতকারী যে নবীজীর কন্যা যয়নব (রাঃ)-কে মদীনায় হিজরত করাকালে ভীষণ নির্যাতন করিয়াছিল। এমনকি সেই দুরাচারের আঘাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের উপর বহু অত্যাচারের অভিযোগ তাহার প্রতি ছিল এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল অগ্রগামী। এমনকি মক্কা বিজয়ের সময় প্রাণদণ্ডের আসামী সেও ছিল। সে নবীজীর দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রাণভয়ে ইরানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য, কিন্তু আপনার দয়া ও ক্ষমার কথা মনে পড়ায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি। রহমতুল লিলআলামীন এই অপরাধীকে রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করিলেন। (সীরাতুন নবী)

মক্কায় খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল ইয়ামামা নামক অঞ্চল। তথাকার গোত্রপতি সুমামা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া ঘোষণা দিলেন– এখন হইতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা হইতে খাদ্য শস্যের একটি দানাও আর মক্কায় যাইবে না। অল্প দিনের মধ্যেই মক্কায় হাহাকার লাগিয়া গেল। বাধ্য হইয়া মক্কাবাসীরা নবীজীর দ্বারে উপস্থিত হইল। মক্কায় খাদ্যাভাবের সংবাদ শুনিয়া রহমতুল লিলআলামীনের দয়া উথলিয়া উঠিল; তৎক্ষণাত তিনি সুমামার প্রতি আদেশ পাঠাইলেন খাদ্য অবরোধ তুলিয়া দিবার জন্য। (সীরাতুন নবী)

তায়েফের ঘটনায় অসাধারণ দয়ার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। যাহারা নবীজীকে অকথ্যভাবে অত্যাচার করিয়া বেহুশ এবং প্রস্তর বর্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ দেহ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল– আল্লাহর আযাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে দয়ার দরিয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ) দোয়া করিয়াছিলেন, আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন।

এই তায়েফবাসীরাই আট দশ বৎসর পরও ইসলামের আহ্বান তীর-তরবারি ও বর্শার আঘাতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালাইয়া ইসলামের প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহাদের ভয়াবহ যুদ্ধে নিহত ও আহত ছাহাবীগণকে উল্লেখ করিয়া তায়েফবাসীদের প্রতি বদ দোয়ার অনুরোধও নবীজীর দরবারে করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন– "আয় আল্লাহ! সকীফ (তায়েফবাসী) গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত কর এবং তাহাদের বন্ধুবেশে মদীনায় হাযির কর।" অচিরেই তায়েফবাসীর ভাগ্যাকাশে সেই দোয়ার নক্ষত্র উদিত হইল– তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হইয়া নবীজীর চরণে শরণ লাভে ধন্য হইল। (সীরাতুন নবী)

নবীজী (সঃ)-কে এই ধরাপৃষ্ঠে সর্বাধিক যাতনা দিয়াছে যাহারা, তাহাদের অন্যতম ছিল মোনাফেক সর্দার

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। মুসলমানদের মধ্যে কত কত ফাসাদ সে সৃষ্টি করিয়াছে! তাহার ষড়যন্ত্রে ও উস্কানিতে কত কত যুদ্ধ বাধিয়াছে, মুসলমানগণ বিপদে পড়িয়াছে! এমনকি নবীজীর মান-সম্মান ঘায়েল করার জন্য পাক-পবিত্র বিবি আয়েশার উপর জঘন্য অপবাদ গড়িয়াছে যাহা মুসিবার জন্য পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই আবদুল্লাহ আজীবন মোনাফেক রহিয়াছে; মোনাফেকীর উপর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার ছিল, তাই নবীজী তাহার জানাযার নামায পড়াইতে সম্মত হইলেন। ওমর (রাঃ) আপত্তি করিলেন এবং তাহার দুষ্কৃতিগুলি এক একটা নবীজীর স্মরণে আনিয়া দিলেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা যে পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন, মোনাফেকদের জন্য আপনি সত্তর বার মাগফেরাত কামনা করিলেও আল্লাহ তাহাদের ক্ষমা করিবেন না– ওমর (রাঃ) ইহাও নবীজীর স্মরণে উপস্থিত করিলেন। দয়ার দরিয়া রহমতুল লিলআলামীন ওমরকে উত্তর দিলেন, সত্তরের অধিক করিলে যদি ক্ষমার আশা হয় তবে আমি সেই চেষ্টাও করিব। (বোখারী শরীফ)

মোনাফেকের জানাযা পড়া এবং তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা তখনও সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছিল না। তাই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দয়াবশে আবদুল্লাহর জানাযা পড়াইয়াছিলেন। তাহার পরেই পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল হয় এবং তাহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

শিশুদের প্রতি নবীজী (সঃ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদারতা, দয়া ও স্নেহ-মমতা এতই সম্প্রসারিত ছিল যে, শিশু–কচিকাঁচারাও তাহা উপভোগ করিত।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (সঃ) বালকদের নিকটবর্তী পথে গমন করিতে তাহাদিগকে সালাম করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একদা এক বিবাহের মজলিস হইতে কচিকাঁচারা তাহাদের মাতাদের সহিত বাড়ী ফিরিতেছিল। দূর হইতে নবীজী তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে স্নেহভরে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খুবই ভালবাসি।

কোন কোন সময় নবীজী (সঃ) কোথাও হইতে মদীনায় প্রবেশকালে কচিকাঁচাদেরকে পথে দেখিলে নিজ বাহনের অগ্র-পশ্চাতে বসাইয়া লইতেন।

একদা এক ছাহাবী তাঁহার শিশু কন্যাকে লইয়া নবীজীর সাক্ষাতে গেলেন। কথাবার্তার মধ্যে এক সময় মেয়েটি তাহার শিশুসুলভ কৌতূহলবশে নবীজীর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুয়ত নাড়িয়া-চাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিল। পিতা কন্যাকে ধমক দিলে নবীজী (সঃ) বারণ করিয়া বলিলেন, তাহাকে খেলিতে দাও! (বোখারী)

মৌসুমের বা কাহারও গাছের প্রথল ফল ছাহাবীগণ নবীজীর নিকট হাদিয়ারূপে নিয়া আসিতেন। নবীজী এই উপলক্ষে মদীনায় ফল ফসলে বরকতের দোয়া করিতেন। অতপর ঐ ফল কোন শিশুকে দিয়া দিতেন! –(বোখারী শরীফ)

নবীজী অনেক সময় শিশু দেখিলে আদর-স্নেহে চুম্বন করিতেন। একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলিল, আমার দশটি সন্তান আছে; আমি কাহাকেও চুম্বন করি না! নবীজী (সঃ) রুষ্টতার সহিত উত্তর দিলেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর হইতে স্নেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন তবে আমি কি করিব?

কৃচ্ছ জীবন যাপন শিক্ষাদানে নবীজী (সঃ)

আয়েশা (রাঃ) দুম্বার লোমে বুনা গায়ে দেওয়ার একখানা কম্বল এবং তহবন্দরূপ পরিধেয় একখানা মোটা চাদর– এ কাপড় দুইখানা দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই পোশাকেই নবীজী পরপারের সফরে ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। (বোখারী)

নবীজী (সঃ)-এর বিছানা সময়ে চামড়ার ভিতরে খেজুর গাছের ছোবড়া ভরা গদি এবং সময়ে লোমের তৈয়ারী চট বা কাপড় ভাঁজ করা হইত; তাহা অধিক নরম হইত না। বিবি হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাত্রে আমি বিছানার কাপড় চারি ভাঁজ করিয়া বিছাইলাম যেন একটু নরম হয়। ভোর বেলা নবীজী (সঃ) এই নরম বিছানার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

একদা নবী (সঃ) খালি চাটাইয়ের উপর শয়ন করিয়াছিলেন; নিদ্রা হইতে উঠিলে দেখা গেল, তাঁহার দেহে চাটাইয়ের রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আরজ করিলেন, অনুমতি দিলে আমরা বিছানা তৈয়ার করিয়া দেই। নবী (সঃ) বলিলেন, দুনিয়ার আরাম-আয়েশে আমার প্রয়োজন কী? দুনিয়ার সঙ্গে ত আমার সম্পর্ক ঐরূপ মাত্র যেরূপ কোন পথিক বিশ্রামের জন্য গাছের ছায়ায় বসিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তাহা ত্যাগ করিয়া যাইবে। (মেশকাত, ৪৪২)

ওমর (রাঃ) বর্ণিত এইরূপ একটি ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৭৫ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

সাধারণ স্বভাবে নবীজী (সঃ)

নবী (সঃ) কখনও কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতেন না। গৃহে আসিতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করিতেন। ভক্ত-অনুরক্ত বন্ধুজনের মধ্যেও পা ছড়াইয়া বসিতেন না।

নবী (সঃ) অত্যধিক লজ্জাশীলও ছিলেন। পর্দানশীন কুমারী কী লজ্জাবতী হয়! নবী (সঃ) তদপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। এমনকি অরুচিকর কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া তাঁহার চেহারার উপর ভাসিয়া উঠিত। (বোখারী)

গৃহের কাজকর্ম নবীজী (সঃ) নিজে করিতেন, এমনকি ছেঁড়া কাপড় জুতা নিজ হাতে সেলাই করিতেন। বাজার হইতে সওদাপত্র নিজে বহন করিয়া আনিতেন। গৃহের বকরী দোহাইতেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার নিজ গৃহে জীবন মান এতই সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পাতলা চাপাতি রুটি চোখেও দেখেন নাই। নিজ গৃহে তাঁহার কোন সময় দিনে দুই বেলা তৃপ্তির সহিত রুটি জুটিত না– এক বেলা রুটি খাইলে আর এক বেলা খোরমা খাইয়া থাকিতে হইত। অনেক সময় সকাল বেলা বিবিগণের ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন– খাবার কিছু আছে কি? যদি বলা হইত কিছু নাই, তবে হযরত (সঃ) এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেন, আচ্ছা! আজ আমি রোযা রাখিলাম। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! আমার জীবন যেন মিসকীনদের অবস্থায় কাটে, মৃত্যুও যেন মিসকীনদের অবস্থায় হয়, হাশর ময়দানেও যেন মিসকীনদের সঙ্গে থাকি। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন এই দোয়া কেন করেন? নবীজী (সঃ) বলিলেন, মিসকীনগণ ধনীদের অনেক আগে বেহেশতে যাইবে। নবীজী (সঃ) আরও বলিলেন, হে আয়েশা! মিসকীনকে খালি হাতে ফিরাইও না; খোরমার এক অংশ হইলেও তাহাকে দিও। হে আয়েশা ! মিসকীনকে ভালবাসা দিও, তাহাদের নিকটে আনিও; আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তোমাকে তাঁহার নিকটে নিবেন। (মেশকাত, ৪৪৭)

নবী (সঃ)-এর নিকট আল্লাহ তাআলা মক্কার কোন পাহাড়কে স্বর্ণের খনি বানাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাঠাইলেন। নবীজী (সঃ) তখন দোয়া করিলেন আয় আল্লাহ! আমি একদিন খাইব আর একদিন না খাইয়া থাকিব। যখন খাইব তখন তোমার শোকর করিব, আর যখন অনাহারী থাকিব তখন সবর করিব। অর্থাৎ এইভাবে শোকর ও সবর উভয় রকমের বন্দেগী আদায় হইবে।

আদর্শ নেতৃত্ব শিক্ষা দানে নবীজী (সঃ)

নবীজীর (সঃ) হৃদয়ে বিবি ফাতেমার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হয় না। সেই ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে ভৃত্য না থাকায় তাঁহাকে নিজ হাতে গৃহকাজ সমাধা করিতে হইত। এমনকি আটার

চাক্কি চালনায় বিবি ফাতেমার হাতে কড়া এবং পানির মশক বহনে বক্ষে নীল রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই জেহাদলব্ধ সম্পদের মধ্যে কতিপয় দাস-দাসী লাভ হইয়াছিল। এই সুযোগে আলী (রাঃ) নবীজীর (সঃ) খেদমতে একটি দাসীর আবেদন পেশ করিলেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, দেখ! এখনও সোফ্‌ফায়ে আশ্রয় গ্রহণকারী ছিন্নমূল লোকদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় নাই। যাবত না তাহাদের সুব্যবস্থা হইয়া যায় তোমাদের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিব না। (আবু দাউদ শরীফ)

আর এক সময় আলী (রাঃ) নবীজীর (সঃ) নিকট কোন আবদার করিলে বলিলেন, তোমাকে দিব আর সোফ্‌ফার নিঃসহায় ব্যক্তিরা ক্ষুধার্ত থাকিবে! এইরূপ কখনও হইতে পারে না। (সীরাতুন নবী–মোসনাদে আহমদ)

একবার নবী (সঃ) ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গলায় স্বর্ণের মালা দেখিতে পাইয়া বলিলেন– হে বৎস! লোকে যদি বলে যে, পয়গম্বরের কন্যার গলায় অগ্নির ফাঁস পড়িয়াছে– তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে কি? (নাসায়ী শরীফ)

দৈনন্দিন অবস্থায় নবীজী (সঃ)

চলাফেরা ঃ পথচলাকালে নবী (সঃ) সম্মুখপানে অবনত দৃষ্টিতে সামান্য ঝুঁকিয়া বিনয়ী আকৃতিতে হাঁটিতেন– যেন উচ্চ হইতে নিচের দিকে অবতরণ করিতেছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন, তাই দ্রুত পথ কাটিত। পা হেছড়াইয়া চলিতেন না।

কথাবার্তা ঃ নবীজী (সঃ) সুস্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে কথা বলিলেতন। তাঁহার কথা অত্যন্ত মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হইত; কথায় তিনি মানুষের মনকে সহজে জয় করিয়া নিতেন; শত্রুগণ তাঁহাকে জাদুকর বলিবার ইহাও একটি কারণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কথা হইলে তাহা তিন বারও বলিতেন; প্রয়োজনে বা সওয়াব লাভের ক্ষেত্র ছাড়া কথা বলিতেন না। বেশী সময় চুপ থাকিতেন– ভাবগম্ভীর অবস্থায় চিন্তামগ্ন থাকিতেন। হাসিতেন কম এবং একমাত্র মুচকি হাসিই হাসিতেন।

ভাষণ বক্তৃতা ঃ তাঁহার ভাষণ বক্তৃতা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ হইত। মাটিতে দাঁড়াইয়া, মিম্বরে আরোহণ করিয়া, বাহনের পৃষ্ঠে থাকিয়া– যখন যেরূপ অবস্থায় প্রয়োজন বা সুযোগ হইত ভাষণ দিতেন। পরকালের ভীতি প্রদর্শনে ভাষণ দিলে প্রাণ যেন তাঁহার উথলিয়া উঠিত, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, গলার স্বর গুরুগম্ভীররূপে উচ্চতর হইয়া উঠিত এবং ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ন্যায় কথায় এবং আওয়াজে তীক্ষ্ণতা আসিয়া যাইত। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হইত তাঁহার সতর্কবাণী; মনে হইত যেন তিনি সকাল বা বিকাল মুহূর্তে আক্রমণে আগত শত্রু সৈন্য হইতে জাতি ও দেশবাসীকে সতর্ক করিতেছেন। বক্তৃতার জন্য মিম্বরে আরোহণ করিয়া লোকদের সম্মুখীন দাঁড়াইতেন এবং সালাম করিতেন। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উপর বৃক্ততা সমাপ্ত করিতেন। ভাষণদানকালে সাধারণত লাঠি বা ধনুর উপর ভর করিতেন। (যাদুল মাআদ)

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ নবীজী (সঃ) সাধারণতঃ লম্বা চাদর আকৃতির তহবন্দ পরিধান করিতেন– সাড়ে চারি হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া। "পায়জামা" সম্পর্কে সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি তাহা খরিদ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গবেষক হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম লিখিয়াছেন, একাধিক হাদীছে প্রমাণিত আছে, তিনি নিজে পায়জামা পরিয়াছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁহার পরামর্শে পায়জামা পরিতেন। (যাদুল মাআদ)

গায়ে দিতে চাদর– যথা ছয় হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া; কামিজ আকারের জামাও তাঁহার প্রিয় ছিল। আবা বা জুব্বাও তিনি পরিধান পরিতেন। আস্তিনের মুখে রেশমী পাড় লাগানো চর্ম নির্মিত নওশেরওয়ানীও তিনি পরিতেন। "উত্তরী" গায়ে দিতেন, সাধারণতঃ তাহা ডোরাবিশিষ্ট ইয়ামান দেশীয় হইত। একই রংয়ের তহবন্দ ও চাদর সময় সময় পরিধান করিতেন; অনেকে তাহা লাল রংয়ের বলিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে লাল রংয়ের কাপড় নবীজী (সঃ) পরিধান করিতেন না, তাহা পরিধান করা মকরূহ;

নবীজীর (সঃ) ঐ কাপড় লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল।

মোজা (অন্ততঃ শীত মৌসুমে) স্বাভাবিকরূপেই ব্যবহার করিতেন। (যাদুল মাআদ)

অযুর সময় (শরীয়তের বিধান অনুযায়ী) মোজার উপর মসেহ করিতেন। আশি জন ছাহাবী নবীজীর (সঃ) চর্ম-মোজার উপর মসেহ করার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাথায় পাগড়ী বা আমামা বাঁধিতেন; বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার কালো রঙ্গের পাগড়ী ব্যবহারের উল্লেখ হাদীছে পাওয়া যায়।

তাঁহার জুতা চর্ম নির্মিত "না-আল' তথা সেন্ডেল আকারের ছিল।

জেহাদে ও রণাঙ্গণে তিনি লৌহবর্ম এবং লোহার শিরাবরণ ব্যবহার করিতেন।

পরিধেয়ের জন্য নবীজী (সঃ) সাদা রং বেশী ভালবাসিতেন; ধূসর বা সোনালী রংও পছন্দ করিতেন, কাল রংয়ের পরিধেয়ও ব্যবহার করিয়াছেন। পুরুষের জন্য লাল রং পছন্দ না করার প্রমাণই বেশী পাওয়া যায়। নবীজীর (সঃ) দুইখানা সবুজ রংয়ের উতরী, একখানা কাল চাদর, আর একখানা মোটা চাদর ছিল লাল রংয়ের। একখানা কম্বলও ছিল। (যাদুল মাআদ)।

খাদ্য ঃ নবীজীর (সঃ) জীবন সাধনাময় ছিল; কঠোর কৃচ্ছ্রই ছিল তাঁহার স্বভাব। সৌখিন বিলাসী খানাপিনার পরিবেশ তাঁহার গৃহে তিনি সৃষ্টিই হইতে দেন নাই। তাঁহার গৃহে চাপাতি রুটি তৈয়ার হইত না, গোশ্‌তও খুব কমই জুটিত, ময়দাও তাঁহার গৃহে দেখা যাইত না– যবের বা গমের মোটা রুটিরই ব্যবস্থা করা হইত। তাঁহার গৃহে উনুনে মাসের পর মাস আগুন জ্বলিত না– পানি ও খোরমার উপর জীবন কাটিত।

সিরকাকেই তিনি রুটি খাওয়ার জন্য তরকারী গণ্য করিতেন। অগ্নিতে পাকানো চর্বি দ্বারাও রুটি খাইতেন। পনির বা খোরমার সঙ্গেও রুটি খাইতেন। শসা জাতীয় সজি কাকড়ি এবং তরমুজের সহিত তাজা পাকা খেজুর খাইতেন। ছাগল বা দুম্বার সামনের রানের গোশ্‌ত তিনি বেশী পছন্দ করিতেন।

আরবের রীতি ছিল, গোশ্‌তের খণ্ড বড় বড় রাখা। খাসি-বকীর রান অনেকে আস্ত রাখিয়া দিত এবং তাহারা গোশ্‌ত অতি মোলায়েম রান্না করিত না। ঐরূপ ক্ষেত্রে খাইবার সময় বাধ্য হইয়া গোশ্‌ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া নিতে হইত, নতুবা নবীজী (সঃ) দাঁতে কাটিয়াই খাইতেন। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় তিনি ছুরি ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, গোশ্‌ত খাইতে ছুরি দ্বারা কাটিও না। তাহা অমুসলমানদের রীতি। তোমরা দাঁতে কাটিয়া খাইও; তাহাতে স্বাদও বেশী পাওয়া যায় এবং সহজও বটে।

খাইবার সময় সাধারণতঃ উভয় ঊরু খাড়া করিয়া বসিতেন; সময়ে উভয় পা পিছন দিকে এবং গোছাদ্বয়ের উপর ঊরুদ্বয় স্থাপন করতঃ ঝুঁকিয়া বসিতেন, আর বলিলেতন, আমি বড় মানুষ নই; আল্লাহর অনুগত দাস। সুতরাং আমার খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা ঐরূপই হইবে। আসন করিয়া বা এক হাতের উপর ভর করিয়া বসিতেন না।

মেজের বা টেবিলের উপর খানা খাইতেন না; সাধারণত তিনি যমীনের উপর দস্তরখানা বিছাইয়া খানা খাইতেন। তাঁহার একটি চামড়ার দস্তরখানা ছিল। সম্মুখ দিক হইতে খানা খাইতেন। সাধারণত তিন আঙ্গুলে খাইতেন এবং খাওয়া শেষ করিয়া আঙ্গুল চাটিয়া খাইতেন। তদ্রূপ খাদ্যের পাত্রও পরিষ্কার করিয়া খাইতেন। খাওয়া বিসমিল্লাহ্‌ বলিয়া আরম্ভ করিতেন এবং সমাপ্তে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা করিতেন– এ সম্পর্কে বিভিন্ন দোয়া হাদীছে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ তিনি মিঠা বস্তু বিশেষতঃ মধু অধিক ভালবাসিতেন। তদ্রূপ সজির মধ্যে কদু বা লাউ অত্যধিক পছন্দ করিতেন।

পানীয় ঃ নবীজী মোস্তফা (সঃ) ঠাণ্ডা পানি বেশী পছন্দ করিতেন। পানি সুস্বাদু করার জন্য সময় সময় পানির সহিত দুধ মিশাইতেন, কোন সময় খোরমা বা কিশমিশ পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই পানি পান করিতেন। কোন সময় ছাতু বা দুধ পানিতে মিশ্রিত করিয়া শরবত পান করিতেন। দাঁড়াইয়া পান করা না পছন্দ করিতেন; বসিয়া পান করিতেন।

অভিরুচি ঃ সব কাজেই যথাসাধ্য ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন। (অবশ্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে এবং মলত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিতে প্রথমে বাম পা অগ্রসর করিতেন।) মাথায় তৈল

অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যবহার করিতেন এবং একদিন অন্তর চিরুণী ব্যবহার করিতেন। চুল দাড়ি সুবিন্যস্ত রাখিতেন। সুগন্ধি ভালবাসিতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

দিনের বেলা ঃ ফজর নামাযান্তে কেবলামুখী আসন করিয়া বসিয়া কিছু সময় যিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সূর্যোদয়ের পর ছাহাবীগণকে শিক্ষাদান, উপদেশদান এবং তাঁহাদের সহিত স্বপ্নের আলোচনা ইত্যাদি কথাবার্তা বলিতেন। কেহ তাঁহার দ্বারা পানি বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য আসিলে তাহা করিয়া দিতেন। বেলা একটু উপরে উঠিলে চাশতের নামায পড়িয়া গৃহে চলিয়া যাইতেন। গৃহে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করিতেন, জনগণকে সাক্ষাতদান করিতেন, যাহাতে বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেন লোকদের শিক্ষাদানে, উপদেশদানে, জনসাধারণের খোঁজ-খবর গ্রহণে তাহাদের অভাব-অভিযোগ সমাধানে। নামাযের সময় মসজিদে আসিয়া নামায পড়িতেন। আসরের নামায পড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং বিবিগণের প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া খোঁজ-খবর লইতেন, আলাপ করিতেন।

রাত্রি বেলা ঃ বিবিগণের প্রত্যেকের জন্য নবীজীর অবস্থান বণ্টন করা ছিল। যাঁহার ঘরে যেই দিন অবস্থান করা হইত, মাগরিবের নামায হইতে অবসর লইয়া সেই ঘরেই আসিতেন এবং রাত্রের খানাপিনা সেই ঘরেই করিতেন। এশার নামায শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন; ঘরে আসিয়া চারি রাকআত নফল নামায পড়িতেন এবং নির্দিষ্ট কতিপয় সূরা তেলাওয়াত করিতেন। অতপর যথা সত্বর শুইয়া পড়িতেন; শয়ন-শয্যার বিভিন্ন দোয়া পড়িতেন এবং বাঁ হাত গালের নীচে রাখিয়া ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। এশার পরে সাধারণতঃ কথাবার্তা পছন্দ করিতেন না। রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে জাগিয়া উঠিতেন এবং এই অবস্থার নির্ধারিত দোয়া পড়িতেন। অতপর চোখ-মুখ হইতে নিদ্রাভাব মুছিয়া সূরা আলে এমরানের শেষ দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতেন। অতপর মেসওয়াক করিতেন এবং মশক হইতে পানি লইযা অযূ করিতেন। তারপর নামাযে দাঁড়ইয়া দুই দুই রাকআতে সাধারণতঃ আট রাকআত তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন। কোন কোন রাত্রে একাধিকবার জাগিয়া উঠিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রভাত ঘনাইয়া আসিলে গৃহিণীকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করিয়া দিতেন। সময়ে ফযরের জামাতের পূর্বে একটু ঘুমাইতেন, সময়ে শুধু ডান পার্শ্বের উপর হেলান দিয়া আরাম করিতেন, সময়ে গৃহিণীর সহিত আলাপ করিতেন। এর মধ্যেই ফজরের সুন্নত দুই রাকআত পড়িয়া নিতেন এবং মোয়াজ্জিনের সংবাদ দানে মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

রাত্রি বেলা দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। এমনকি তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত; রসের ভারে পায়ের চামড়া ফাটিয়াও যাইত। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইত যে, আপনার ত কোন গোনাহ নাই; (অর্থাৎ তবে কেন এত এবাদতের কষ্ট করেন?) নবীজী উত্তরে বলিতেন, যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আমি তাঁহার শোকরগুজারী করিব নাকি?

উম্মতের সমবেদনায় নবীজী (সঃ)

উম্মতের জন্য তাঁহার যে দরদ এবং স্নেহ-মমতা ছিল। তাহা একমাত্র রহমতুল লিলআলামীনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে নফল নামায পড়াকালে নবী (সঃ) এই আয়াতে পৌঁছিলেন- اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আপনি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দেন দিতে পারেন; কারণ তাহারা আপনারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা করিয়া দেন তাহাও করিতে পারেন- কাহারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হইবে না; আপনি সর্বশক্তিমান, হেকমতওয়ালা।" (পারা-৭, রুকু-১৬)

কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উম্মত সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে যেই প্রার্থনা করিবেন সেই আলোচনা উক্ত আয়াতে রহিয়াছে। তাহা তেলাওয়াত করিতেই নবীজী (সঃ) নিজের উম্মতের স্মরণে ডুবিয়া পড়িলেন এবং ঐ একটি মাত্র আয়াতের তেলাওয়াতে রাত্র প্রভাত করিয়া ফেলিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার দ্বারা নবী (সঃ) সূরা নেসা তেলাওয়াত

করাইয়া শুনিতেছিলেন। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا -

"কি অবস্থা হইবে তখন যখন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে তাহাদের সম্পর্কে সাক্ষীরূপে এবং আপনাকেও আপনার উম্মত সম্পর্কে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ।"(পারা- ৫, রুকু- ৬)

এই আয়াতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (সঃ) আমাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। হাশরের মাঠে নবীজীর (সঃ) উম্মতের বিপদ সম্পর্কে এই আয়াতে আলোচনা হইয়াছে- তাহা স্মরণেই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর শত শত ঘটনা হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাশরের মাঠে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আদি-অন্তের বিশ্ব মানবের তারপর স্বীয় উম্মতের কত কত উপকার করিবেন তাহার কিঞ্চিত বর্ণনা সপ্তম খণ্ডে কেয়ামত ও হাশরের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা নবীজী (সঃ)-এর সহিত মক্কা হইতে মদীনার পানে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় নবীজী (সঃ) বাহন হইতে অবতরণ করিয়া আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইলেন এবং দীর্ঘ সময় মোনাজাত করিলেন। অতপর সেজদায় চলিয়া গেলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া পুনরায় দীর্ঘ মোনাজাত করিলেন। আবার সুদীর্ঘ সেজদা করিলেন। এইভাবে পুনঃ পুন সেজদা ও মোনাজাত হইতে অবসর হইয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমি আমার উম্মতের মাগফেরাতের জন্য হাত তুলিতেছিলাম। এক এক বারের মোনাজাতে আংশিকভাবে আমার দোয়া কবুল হইত; আমি তাঁহার কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত হইয়া শোকর আদায় করিতাম এবং পুনঃ অধিক মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করিতাম। তাই আমি পুনঃ পুনঃ মোনাজাত ও সেজদা করিয়াছি। (আবু দাউদ শরীফ)

রহমতুল লিলআলামীনের মূল তাৎপর্য

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শিক গুণাবলীর আলোচনা অতি সুদীর্ঘ। হাদীছ ভাণ্ডারে তাহার যে তথ্য ও নজির পাওয়া যায়, বহু গ্রন্থেও তাহার সঙ্কলন শেষ হইবে না। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর তথ্যাবলী রহমতুল লিলআলামীনের মূল তাৎপর্য নহে, বরং কিঞ্চিত আভাস মাত্র- তাহাও শুধু স্থূল দৃষ্টিবাদীদের জন্য। নবীজী মোস্তফা (সঃ) যে রহমতুল লিলআলামীন ছিলেন তাহার মূল তাৎপর্য ঐসব জাগতিক আদর্শ শ্রেণীর সমুদয় তথ্য হইতে বহুঊর্ধ্বের; বহু ঊর্ধ্বের।

আল্লাহ ভোলা মানবকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া আল্লাহর পথের অন্ধকে চক্ষু দান করা, ঐ পথের বধিরকে আল্লাহর ডাক শুনানো- ইহা ছিল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবন সাধনা ও সর্বদার তৎপরতা। ইহার দ্বারাই মানব তাহার চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি সুখ লাভ করিতে পারে। সুতরাং মানুষের মুখ্য কল্যাণ-মঙ্গল যাহা তাহারই জন্য নবীজীর সারা জীবন উৎসর্গীত ছিল। অন্য সকল নবীই এই কাজ করিয়াছেন; সকল নবী-রসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত ছিলেন। কিন্তু যেমন, সকল ডাক্তারই রোগের চিকিৎসা করেন, তন্মধ্যে কোন ডাক্তারকে আল্লাহ তাআলা বৈশিষ্ট্য দিয়া থাকেন সহজ-সুলভ ব্যবস্থার, কম ঔষধে, অল্প ব্যয়ে দ্রুত রুগীদের আরোগ্যের পথে নিয়া যাওয়ার অন্যান্য নবী-রসূলগণের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যও তদ্রূপই ছিল।

মানবের মুখ্য কল্যাণ ও আসল মঙ্গল চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

অর্থ ঃ "দোযখ হইতে মুক্তি ও বেহেশত লাভ- ইহাই হইল সাফল্য। দুনিয়ার জীবন ত শুধু ধোকার বস্তু।" (পারা- ৪, রুকু- ১৯)

মানবকে এই সাফল্যের যোগ্য বানাইতে নবী ভিন্ন অন্য কোন মানুষই কিছু দান করিতে পারেন না।

সকল নবী-রসূলের মধ্যে নবীজী (সঃ) মানব জাতির জন্য এই যোগ্যতার পথ সুগম ও সহজ-সুলভ করিতে সর্বাধিক বেশী কৃতকার্য হইয়াছেন। যাহার ফলে এক বা দুই লক্ষের অধিক নবী-রসূলের উম্মত সমষ্টিগতভাবে যত সংখ্যায় বেহেশতী হইবে, একা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত তাহার দ্বিগুণ সংখ্যায় বেহেশতী হইবে। তাই তাঁহার আখ্যা হইয়াছে–

রহমতুল লিলআলামীন
ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী
ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম

الشوق والحنين الى مدينة سيد المرسلين

প্রাণের আবেগ, নয়নের অশ্রু মদীনার আকর্ষণ

১৯৭৯ সনে দীর্ঘ দিন পর হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনার সুযোগ লাভ হয়। খোদার ঘর এবং হাবীবের শহর মদীনা হইতে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত থাকায় প্রাণ কাঁদিতেছিল, মনের আবেগ উথলিয়া উঠিতে ছিল। আবেগপূর্ণ প্রাণ এবং অশ্রুসজল চোখের তাগাদায় এই কাসিদা রচনা আরম্ভ হয় এবং হাবীবের দুয়ারে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত বয়েতসমূহ হৃদয়পটে জাগিয়া উঠিতে থাকে। সেই শুভলগ্নের কাসিদাটি পাঠকদের জন্য বিশেষ সওগাতরূপে পেশ করা হইল।

(١) مَنَعْتُ عُيُوْنِىْ عَنْ دُمُوْعٍ مُكَرَّرًا ـ وَرَاوَتُّهَا عَنْ رَنَّةٍ كَىْ تَصَبَّرَا

(১) আমি আমার চক্ষুদ্বয়কে বারংবার অশ্রু বহাইতে নিষেধ করিয়াছি এবং তাহাদেরকে রোদন-ক্রন্দন হইতে বারণ করার চেষ্টা করিয়াছি, যেন ধৈর্যধারণ করে।

(٢) وَجَرَّعْتُ نَفْسِىْ حُزْنَهَا وَغُمُوْمَهَا ـ وَاَلْهَيْتُهَا عَنْهَا لِئَلاَّ تَفَكَّرَا

(২) আর নিজের মনকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হজম করাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাকে তাহা হইতে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছি, যেন সে ব্যাকুল না হয়।

(٣) وَلٰكِنَّ دُمُوْعِىْ كَالسُّيُوْلِ تَدَفَّقَتْ ـ فَصَارَتْ عُيُوْنِىْ كَالْعُيُوْنِ تَفَجَّرَا

(৩) কিন্তু নয়নের অশ্রু বন্যার স্রোতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছে; ফলে চোখযুগল ঝর্ণার ন্যায় প্রবাহমান হইয়া গিয়াছে।

(٤) وَلَيْسَ لَهَا حُبُّ الْحِسَانِ وَوُدُّهَا ـ فَمِنْ بُعْدِهَا اَسْى وَاَبْكِى تَحَسُّرًا

(৪) আমার মনে সুন্দরীদের প্রেম-ভালবাসা নাই যে, আমি তাহাদের বিচ্ছেদে দুঃখিত হইব এবং সেই অনুতাপে কাঁদিব।

(٥) وَلٰكِنَّ بِىْ حُبُّ الْمَدِيْنَةِ طَيْبَةٍ ـ فَمِنْ بُعْدِهَا اَسْى وَاَبْكِى تَذَكُّرًا

(৫) হাঁ, আমার ভিতরে রহিয়াছে মদীনা তাইয়্যেবার ভালবাসা; তাহা হইতে দূরে থাকায়ই আমার দুঃখ এবং তাহার স্মরণেই আমি কাঁদি।

(٦) تَذَكَّرْتُ اٰثَارَ الْمَدِيْنَةِ طَيْبَةٍ ـ فَصَارَ فُؤَادِىْ نَحْوَهَا قَدْ تَطَيَّرَا

(৬) যখন স্মরণে আসে আমার মদীনা তাইয়্যেবার নিদর্শনসমূহ; তৎক্ষণাত আমার প্রাণপাখী তৎপ্রতি উড়িয়া ছুটে।

(٧) مَدِيْنَةُ مَحْبُوْبٍ حَيَاةٌ لِّمُؤْمِنٍ ـ لِيَارُزُ اِيْمَانٌ اِلَيْهَا مُسَخَّرًا

(৭) প্রিয় নবীর মদীনা মোমেনদের জীবন; ঈমান (মোমেনকে লইয়া) তৎপ্রতি ধাবমান হয় তাহার আকর্ষণে।

(٨) يَفُوْحُ بِهَا رِيًّا الْحَبِيْبِ كَأَنَّهَا ـ نَسِيْمُ الصَّبَاحِ جَائَتْ عَبِيْرًا مُعَطَّرًا

(৮) ঐ মদীনায় প্রিয় নবীর সুগন্ধি এমনভাবে ছড়াইতে থাকে– মনে হয় সম্পূর্ণ মদীনা যেন প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুর ন্যায় আম্বরের আতর নিয়া আসিয়াছে।

(٩) يَلُوْحُ بِهَا آثَارُهُ وَرُسُوْمُهُ ـ فَتَجْذِبُنَا شَوْقًا اِلَيْهَا مُجَرَّرًا

(৯) ঐ মদীনায় উজ্জ্বল অবস্থায় বিদ্যমান আছে প্রিয় নবীর নিদর্শন ও স্মৃতিসমূহ– ঐ সবই আমাদেরকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া নেয় তাহার আসক্ত করিয়া।

(١٠) جِبَالٌ وَاَكَامٌ وَّاَرْضٌ وَّمَشْهَدٌ ـ يَقُوْدُ بِنَا حُبًّا اِلَيْهَا مُسَخَّرًا

(১০) বিভিন্ন পাহাড়, বিভিন্ন টিলা, বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন স্থান ,যেখানে নবী (সঃ) পদার্পণ করিয়াছেন ঐগুলি আমাদিগকে মদীনার প্রতি আসক্ত বানাইয়া যাদুগ্রস্তরূপে টানিয়া নেয়।

(١١) وَبِيْرٌ وَاُطَامٌ يُّجَدِّدُ ذِكْرَهُ ـ وَمَسْجِدُ مَحْبُوْبٍ تَرَاهُ مُنَوَّرًا

(১১) বিভিন্ন কূপ (যেগুলির পানি নবী (সঃ) পান করিতেন), বিভিন্ন উঁচু বাড়ী (যাহার উপর নবী (সঃ) আরোহণ করিয়াছেন–) এইগুলি নবীজীর স্মরণ তাজা করিয়া দেয়, আর প্রিয় নবীর নূরপূর্ণ মসজিদ ত দৃশ্যমান অবস্থিত আছেই।

(١٢) اَسَاطِيْنُهُ تُبْدِىْ الْحَبِيْبَ خِلاَلَهَا ـ يَلُوْحُ بِهَا نَقْشٌ وَلَوْنٌ مُفَسِّرًا

(১) ঐ মসজিদের খুঁটিসমূহ প্রাণপ্রিয় নবী (সঃ)-কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে– যেন তিনি ঐগুলির আঁকে বাঁকে ফাঁকে ফাঁকে চলা ফেরা করিতেছেন। (কোনগুলির মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল করিতেন, কোনটার নিকটে দাঁড়াইয়া খোতবা– ভাষণ দিতেন, ইহা) ব্যাখ্যাকারী চিহ্ন– রং ও নকশা তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(١٣) وَمِحْرَابُهُ يُبْدِىْ الْحَبِيْبَ مُصَلِّيًا ـ يَقُوْمُ بِقُرْاٰنٍ مُسِرًّا وَّجَاهِرًا

(১৩) ঐ মসজিদের মেহরাব প্রাণপ্রিয়কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে– তিনি যেন নামায পড়িতেছেন, তিনি যেন তথায় দাঁড়াইয়া কোরআন শরীফ পড়েন সশব্দে বা নিঃশব্দে।

(١٤) وَمِنْبَرُهُ يَحْكِى الْحَبِيْبَ مُخَاطِبًا ـ يَقُوْمُ عَلَيْهِ بِالشَّرَائِعِ مُخْبِرًا

(১৪) ঐ মসজিদের মিম্বার প্রাণপ্রিয়কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে– তিনি যেন তাহার উপর দাঁড়াইয়া খোতবা পাঠ করিতেছেন এবং শরীয়তের আদেশাবলী বয়ান করিতেছেন।

(١٥) وَرَوْضَتُهُ مِنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ بُقْعَةٌ ـ فَمَنْ يَّاتِهَا يَخْلُدْ خُلُوْدًا مُقَرَّرًا

(১৫) ঐ মসজিদের (চিহ্নিত করা) বেহেশতের বাগান বস্তুতই চিরস্থায়ী বেহেশতের খণ্ড বিশেষ; অতএব যেব্যক্তিই তথায় পৌছিতে পারিবে স্থায়ীভাবে বেহেশতী হইয়া যাইবে।

(١٦) وَقُبَّتُهُ الْخَضْرَاءُ رُوْحُ قُلُوْبِنَا ـ يُحِيْطُ بِهَا نُوْرٌ عَلَى النُّوْرِ وَافِرًا

(১৬) ঐ মসজিদ সংলগ্নে যে সবুজ গুম্বজ রহিয়াছে– তাহা ত আমাদের অন্তরের জন্য আত্মা স্বরূপ, তাহা ঘিরিয়া রহিয়াছে অজস্র নূর।

(١٧) تُظِلُّ عَلَى خَيْرِ الْخَلاَئِقِ كُلِّهَا ـ وَتُحْرِزُ مَا يَعْلُوْ عَلَى الْعَرْشِ فَاخِرًا

(১৭) ঐ সবুজ গুম্বজই ছায়া দিয়া রহিয়াছে সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টের উপর এবং সে এমন ভূখণ্ডকে ঘিরিয়া আছে যাহা আরশের উপরও গর্ব করে।

(١٨) لِيَغْفِرُ مَنْ يَّاْتِىْ اِلَيْهَا بِتَوْبَةٍ ـ وَاَنْوَارُهَا تُعْطِى لِمَنْ جَاءَ زَائِرًا

(১৮) যেব্যক্তিই তওবার সহিত ঐ গুম্বজের নিকট উপস্থিত হইবে তাহারই গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং যেই তাহার যেয়ারতে আসিবে তাহাকেই তাহার নূর দান করা হইবে।

(١٩) يَسُوْقُ بِنَا حُبُّ الْمَدِيْنَةِ حَادِيًا ـ يَقُوْدُ بِنَا الْمَحْبُوْبُ مِنْهَا مُسَخَّرًا

(১৯) মদীনার প্রেম যেন তারানা গাহিয়া আমাদের হাঁকাইয়া নেয়! আর প্রাণপ্রিয় যেন তথা হইতে আমাদের টানিয়া-হেঁচড়াইয়া নিয়া যায়।

(٢٠) تَشَقَّقَ قَلْبِيْ اِذْ ذَكَرْتُ مَدِيْنَةَ ـ وَسَالَتْ عُيُوْنِيْ بِالدِّمَاءِ تَغَزُّرَا

(২০) মদীনা স্মরণে আমার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং নয়নযুগল বন্যার ন্যায় রক্ত বহায়।

(٢١) بُكَائِيْ عَلٰى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ ذَرَّةٌ ـ وَاِنْ كَانَ عُمْرِيْ بِالْبُكَاءِ مُكَرَّرَا

(২১) মদীনার বিচ্ছেদে যতই কাঁদি তাহা অতি সামান্যই পরিগণিত হইবে, যদিও কাঁদিবার জন্য আমার বয়স কয়েক গুণ দেওয়া হয়।

(٢٢) دُمُوْعِيْ عَلٰى حُزْنٍ الْمَدِيْنَةَ قَطْرَةٌ ـ وَلَوْ اَنَّهَا سَالَتْ بِحَارًا وَاَنْهُرَا

(২২) মদীনার বিচ্ছেদ-দুঃখে আমার অশ্রুর সমষ্টি এক ফোঁটা মাত্র গণ্য হইবে, যদিও আমার অশ্রু দ্বারা বহু সমুদ্র ও নদী বহিয়া যায়।

(٢٣) حَيَاتِيْ عَلٰى هِجْرَانِهَا مِثْلُ مَوْتَةٍ ـ وَلَوْ كُنْتُ فِى النُّعْمٰى وَعَيْشٍ مُخَضَّرَا

(২৩) মদীনা হইতে দূরে থাকিয়া আমার জীবন মৃত্যুতুল্য, যদিও আমি অজস্র নেয়ামতের মধ্যে এবং সুন্দর জিন্দেগীতে থাকি।

(٢٤) وَعَيْشِيْ عَلٰى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ مُرَّةٌ ـ وَلَوْ كُنْتُ فِيْ رَوْحٍ وَّخَيْرٍ مُّوَفَّرَا

(২৪) মদীনা হইতে দূরে থাকায় আমার জীবন তিক্ত, যদিও আমি শত আনন্দ ও পরিপূর্ণ সুখে থাকি।

(٢٥) وَكَيْفَ التَذَاذِيْ بِالْحَيَاةِ مُفَارِقًا ـ مَدِيْنَةَ مَحْبُوْبٍ لَهَا الْقَلْبُ سُجِّرَا

(২৫) প্রাণপ্রিয় নবীজীর মদীনার জন্য সর্বদা অন্তরে আগুন জ্বলে; সেই মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া জীবনের স্বাদ আমি কিরূপে পাইতে পারি?

(٢٦) وَصِرْتُ اُقَاسِيْ مِنْ بُعْدِهَا وَفِرَاقِهَا ـ شَدَائِدَ اَشْوَاقٍ فَقَلْبِيْ تَكَسَّرَا

(২৬) দীর্ঘ দিন যাবত মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন ও দূরে থাকিয়া অনেক আবেগ সহ্য করিয়া যাইতে হইয়াছে, যদ্দরুন অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে।

(٢٧) وَلَمَّا اَتَيْتُ الْبَابَ بَابَ مَدِيْنَةٍ ـ خَرَرْتُ لِرَبِّيْ سَاجِدًا مُّتَشَكِّرَا

(২৭) তাই মদীনার দরজায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে শোকরের সেজদায় পড়িয়া গিয়াছি।

(٢٨) وَصَلْتُ اِلٰى بَابِ الْحَبِيْبِ مُسَلِّمًا ـ فَصَاحَ فُؤَادِيْ بِالسُّرُوْرِ مُكَبِّرَا

(২৮) তারপর প্রাণপ্রিয় নবীজীর দুয়ারে সালাম পাঠ করতঃ পৌঁছিয়াছি; তখন আমার প্রাণ আনন্দে তকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিয়াছে।

(٢٩) وَقَرَّتْ عُيُوْنِيْ اِذْ اَتَيْتُ بِبَابِهٖ ـ وَصَارَ فُؤَادِيْ مِنْ هُمُوْمٍ مُطَهَّرَا

(২৯) তাঁহার দুয়ারে পৌঁছিয়া আমার চোখ শীতল এবং মন সব চিন্তা-ভাবনা হইতে পাক-ছাফ হইয়া গিয়াছে।

(٣٠) هُمُوْمٌ وَاَحْزَانٌ لَدَيْهِ تَبَدَّلَتْ ـ رَجَاءً وَّاٰمَالاً وَّشَوْقًا مُّكَثَّرَا

(৩০) তাঁহার নিকটে আসিয়া সব চিন্তা ভাবনা অনেক অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

(٣١) ذُنُوْبٌ وَّاٰثَامٌ لَدَيْهِ تُكَفَّرُ ـ فَيَا اَيُّهَا الْعَاصِيْ تَعَالَ لِتُغْفَرَا

(৩১) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সকল প্রকার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব হে গোনাহগার! এই দুয়ারে আস যেন তোমাকে ক্ষমা করা হয়।

(٣٢) اَيَا زُمْرَةَ الْعَاصِيْ تَعَالَوْا لِرَحْمَةٍ ـ اِلٰى رَحْمَةٍ كَانَتْ مِنَ اللّٰهِ مَظْهَرَا

(৩২) হে গোনাহগারের দল! রহমত লাভের জন্য রহমতের দুয়ারে ছুটিয়া আস; যিনি আল্লাহর রহমতের বিকাশস্থল।

(٣٣) اِلٰى رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ جَمِيْعِهِمْ ـ يَبِيْتُ لَهُمْ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ سَاهِرَا

(৩৩) সারা জাহানের জন্য যিনি রহমত তাঁহার নিকট আস; যিনি জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা চাহিতে থাকিয়া নিদ্রাশূন্য রাত্র কাটাইতেন।

(٣٤) يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ـ لِأُمَّتِهِ يَبْكِيْ لِلشَّدَائِدِ ذَاكِرًا

(৩৪) বিছানা হইতে দূরে থাকিয়া রাত্র কাটাইতেন; স্বীয় উম্মতের কঠিন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেন।

(٣٥) وَسَمَّاهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ بِرَحْمَةٍ ـ فَرَحْمَتُهُ تُرْجٰى لَدَيْهِ وَتُشْتَرٰى

(৩৫) সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার নাম রাখিয়াছেন "রহমত"; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতেই সৃষ্টিকর্তার রহমতের আশা করা যায় এবং লাভ হইতে পারে।

(٣٦) هُوَ الْمُرْسَلُ الْهَادِيْ اِلَى النَّاسِ رَحْمَةً ـ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا مُشْفِقًا وَّمُبَشِّرًا

(৩৬) তিনি বিশ্ব মানবের প্রতি পথপ্রদর্শক ও রহমতরূপে এবং অতি কোমল, দয়ালু, স্নেহশীল ও সুসংবাদদাতারূপে প্রেরিত।

(٣٧) نَذِيْرًا لَهُمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ يَّضُرُّهُمْ ـ شَفِيْعًا لَّهُمْ عِنْدَ الْمَصَائِبِ نَاصِرًا

(৩৭) এবং সতর্ককারীরূপে মানবের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষতিকারক বস্তু হইতে, তাহাদের জন্য সুপারিশকারীরূপে এবং বিপদ ক্ষেত্রে সাহায্যকারীরূপে।

(٣٨) مَصَائِبُ دُنْيَا بِاسْمِهِ تَتَفَتَّتُ ـ مَصَائِبُ عُقْبٰى بِالشَّفَاعَةِ لَنْ تُرَا

(৩৮) দুনিয়ার অনেক মসিবত তাঁহার নামের বরকতে দূরীভূত হইয়া যায়, আর আখেরাতের মসিবত তাঁহার শাফাআতের দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

(٣٨) شَفَاعَتُهُ تُمْحِي الذُّنُوْبَ وَاَنَّهَا ـ لَتَنْفِيْ وَاِنْ كَانَتْ مَعَاصٍ كَبَائِرًا

(৩৯) তাঁহার শাফাআত গোনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে এবং কবীরা গোনাহ হইলেও দূর করিয়া দিবে।

(٤٠) لَيَشْفَعُ فِي الْحَشْرِ لِاَهْلِ كَبَائِرٍ ـ وَيُخْرِجُ مِنْ نَّارٍ كَثِيْرًا وَاَكْثَرًا

(৪০) কবীরা গোনাহকারীদের জন্যও তিনি হাশরের দিন শাফাআত করিবেন এবং অনেককে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন।

(٤١) يَقُوْمُ مَقَامًا يَحْمَدُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ـ وَيَسْجُدُ لِلّٰهِ سُجُوْدًا مُّؤَثِّرًا

(৪১) কেয়ামত দিবসে তিনি এমন এক উচ্চস্থান লাভ করিবেন যাহার ফলে সকল মানুষ তাঁহার প্রশংসামুখর হইবে এবং তিনি (সকল মানুষের) চাহিদা পূরণ করিবেন।

(٤٢) شَفَاعَتُهُ الْكُبْرٰى تَعُمُّ جَمِيْعَهُمْ ـ لِيَشْفَعُ اِذْ جَاءَ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَا

(৪২) তাঁহার শাফাআতে কোবরার উপকারে সকল মানুষ উপকৃত হইবে। দুঃখ যাতনায় মানুষের কলিজা যখন মুখে আসিয়া যাইবে তখন তিনি শাফাআত করিবেন।

(٤٣) يَقُوْمُ اِذَا صَاحَ النَّبِيُّوْنَ خَشْيَةً ـ بِنَفْسِيْ بِنَفْسِيْ خَاشِعًا مُتَحَيِّرًا

(৪৩) নবীগণ যখন ভীত হইয়া নফসী নফসী বলিতে থাকিবেন তখন তিনি (লোকদের জন্য) বিচলিত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির জন্য বিনয়ীভাবে দাঁড়াইবেন–

(٤٤) وَيَدْعُوا الْاِلٰهَ سَاجِدًا تَحْتَ عَرْشِهِ ـ وَيَحْمَدُهُ حَمْدًا جَدِيْدًا مُّؤَقَّرًا

(৪৪) এবং আরশের নীচে সেজদাবনত হইয়া আল্লাহকে ডাকিবেন, আল্লাহর প্রশংসা অতি উচ্চমানে নূতনভাবে করিবেন। তখন–

(٤٥) يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ ارْفَعِ الرَّاْسَ وَاشْفَعَنْ ـ تُشَفَّعْ وَسَلْنِيْ مَا تُرِيْدُ لِاَمْرًا

(৪৫) প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাকে বলিলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ গৃহীত হইবে এবং যাহা ইচ্ছা বলুন; তাহা পূরণের আদেশ দিব।

(٤٦) يُسَارِعُ فِيْمَا يَشْتَهِيْ رَبُّهُ لَهُ ـ وَيُعْطِيْهِ مَا يَرْضٰى وَلَنْ يَتَاَخَّرَا

(৪৬) তিনি যাহাই আবদার করিবেন পরওয়ারদেগার তাহা দ্রুত পূরণ করিবেন এবং যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন পরওয়ারদেগার অবিলম্বে তাহাই দিবেন।

(٤٧) لَقَدْ حَازَ مَا قَدْ نَالَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ ـ لأُمَّتِهِ مِنْ دَعْوَةٍ لَنْ تُؤَخَّرَا

(৪৭) প্রভুর নিকট হইতে তিনি যে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার লাভ করিয়াছেন যাহা গৃহীত হওয়ায় মোটেই বিলম্ব হইবে না– সেই দোয়াটিও তিনি উম্মতের জন্য জমা রাখিবেন।

(٤٨) عَلَيْكَ سَلاَمٌ يَا حَبِيْبَ الْمُكَرَّمْ ـ اَتَيْتُ لأَحْظَى مِنْ سَلاَمِكَ حَاضِرًا

(৪৮) আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর সম্মানিত হাবীব! আমি উপস্থিত হইয়াছি আপনার দ্বারে সালাম করার সৌভাগ্য লাভের জন্য।

(٤٩) اَتَيْتُكَ مِنْ بُعْدٍ بِشَوْقٍ وَّرَغْبَةٍ ـ رَجَائِىْ كَثِيْرًا اَنْ يُّعَدَّى وَيُحْصَرَا

(৪৯) আমি বহু দূর হইতে আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি আবেগ ও বাসনা লইয়া; আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সীমা-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

(٥٠) اَتَيْتُكَ اَرْجُوْا مِنْ نَوَالِكَ وَافِرًا ـ اَتَيْتُكَ اَخْشَى مِنْ ذُنُوْبِىْ لِتَنْصُرَا

(৫০) আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি আপনার বেশী বেশী দানের আশা নিয়া। আমার গোনাহের দরুন ভীত হইয়া আপনার সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছি।

(٥١) فَاَنْتَ لَدَى رَبِّىْ شَفِيْعٌ مُشَفَّعٌ ـ شَفِيْعٌ لِّكُلِّ جَاءَ عِنْدَكَ زَائِرًا

(৫১) কারণ, আপনি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট গ্রহণীয় সুপারিশকারীরূপে নির্ধারিত; আপনি প্রত্যেক যিয়ারতকারীর জন্য শাফাআত করিবেন– (ইহা আপনার ওয়াদা)।

(٥٢) يُسَارِعُ رَبِّىْ فِىْ هَوَاكَ لِحُبِّهِ ـ فَجِئْتُكَ اَبْغِىْ مِنْ لُهَاكَ لأَغْفَرَا

(৫২) আমার পরওয়ারদেগার আপনার খাহেশ দ্রুত পূরণকারী, কারণ তিনি আপনাকে ভালবাসেন; তাই আমি আমার মাগফেরাতের জন্য আপনার সাহায্য কামনায় ছুটিয়া আসিয়াছি।

(٥٣) وَرَبُّكَ يَهْوٰى مَاتُرِيْدُ وَتَشْتَهِىْ ـ فَكُنْ اَنْتَ لِىْ عَوْنًا شَفِيْعًا وَّنَاصِرًا

(৫৩) আপনার প্রভু আপনার ইচ্ছা-অভিলাষ পূরণ করা ভালবাসেন। অতএব আপনি আমার জন্য সহায়, শাফাআতকারী ও সাহায্যকারী হউন।

(٥٤) ذُنُوْبِىْ وَاٰثَامِىْ كَثِيْرٌ وَّلاَ اَرٰى ـ سِوَاكَ شَفِيْعًا عِنْدَ رَبِّىْ لِيَغْفِرَا

(৫৪) আমার গোনাহ ও অপরাধ অনেক; আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি দেখি না, যে আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা করার জন্য শাফাআত করিবে।

(٥٥) اَتَيْتُكَ مَجْرُوْحًا مِّنَ الذَّنْبِ هَارِبًا ـ فَكُنْ اَنْتَ لِىْ مَوْلاً طَبِيْبًا وَجَابِرًا

(৫৫) ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়া, গোনাহ হইতে পলায়ন করিয়া আপনার দুয়ারে পৌঁছিয়াছি; আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার আহত হৃদয়ের চিকিৎসা করুন এবং পট্টি বাঁধুন।

(٥٦) اَتَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْوَرٰى لِشَفَاعَةٍ ـ وَلَنْ يُّحْرَمُ الرَّاجِىْ بِبَابِكَ طَاهِرًا

(৫৬) হে সৃষ্টির সেরা আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি শাফাআতের জন্য; আপনার পবিত্র দরবার হইতে কোন আশাবাদী বঞ্চিত যায় না।

(٥٧) ظَلَمْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَجِئْتُكَ تَائِبًا ـ وَمُسْتَغْفِرًا رَبِّىْ كَرِيْمًا وَّسَاتِرًا

(৫৭) আমি নিজের উপর জুলুম করিয়া তওবা করতঃ দয়াল ও ক্ষমাকারী প্রভুর দরবারে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে আপনার নিকট আসিয়াছি।

(٥٨) فَلَوْ اَنَّكَ اسْتَغْفَرْتَهُ لِىْ وَجَدْتُهُ ـ رَحِيْمًا وَتَوَّابًا لِذَنْبِىْ غَافِرًا

(৫৮) এমতাবস্থায় যদি আপনি পরওয়ারদেগারের নিকট আমার জন্য ক্ষমার আবেদন করেন তবে আমি তাঁহার দয়া লাভ করিব, তিনি আমার তওবা কবুল করিবেন এবং আমার গোনাহ মাফ করিবেন।

(٥٩) وَهٰذَا الْوَعْدُ مِّنْ كَرِيْمٍ وَّقَادِرٍ ـ وَوَعْدَ كَرِيْمٍ بِالْوَفَاءِ تَقَدَّرًا

(৫৯) ইহা সর্বশক্তিমান দয়ালু প্রভুরই অঙ্গীকার; আর দয়াবানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত।

(٦٠) اَتَيْتُ بِاٰمَالٍ لَدَيْكَ كَثِيْرَةً ـ فَيَالَيْتَ لِيْ رُجْعَى نَجِيْحًا وَّشَاكِرًا

(৬০) অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; খোদা করুন! আমি যেন সফলকাম ও কৃতজ্ঞরূপে প্রত্যাবর্তন করি।

(٦١) رَجَائِىْ بِرَبِّىْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةَ ـ فَاَرْقُدُ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرًا

(৬১) আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা– আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণপ্রিয় নবীজীর ছায়ায় চির নিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশরের মাঠেও যাইতে পারি।

(٦٢) اِلٰهِىْ عَلٰى بَابِ الْحَبِيْبِ رَجَوْتُهُ ـ فَهَلْ اَنْتَ تُعْطِيْنِيْهِ حَتْمًا مُّقَدَّرًا

(৬২) হে মা'বুদ! তোমার হাবীবের দুয়ারে বসিয়া এই আশা পোষণ করিলাম; তুমি কি আমাকে এই আশার বস্তু সুনিশ্চিতরূপে দান করা সাব্যস্ত করিয়া দিবে?

(٦٣) عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ الْمُعَظَّمُ ـ سَلَامُ غَرِيْبٍ قَدْ اَتَاكَ مُسَافِرًا

(৬৩) হে আল্লাহর সম্মানিত হাবীব আপনার প্রতি সালাম– ইহা এক বিদেশী খাদেমের সালাম; সে অনেক দূরের পথ সফর করিয়া আপনার দরবারে হাযির হইয়াছে।

(٦٤) سَلَامُ عَزِيْزَ الْحَقِّ عَبْدٌ اَضَرَّهُ ـ ذُنُوْبٌ وَّاٰثَامٌ فَجَائَكَ حَائِرًا

(৬৪) আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম; তাহাকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহার গোনাহ ও অপরাধসমূহ, তাই সে দিশাহারা হইয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছে।

(٦٥) فَاَنْتَ كَرِيْمٌ مَا لِفَضْلِكَ غَايَةً ـ فَهَلْ اَنْتَ تُؤْوِيْنِىْ لَدَيْكَ لِتَنْظُرًا

(৬৫) আপনি দয়ালু, আপনার দয়ার কোন সীমা নাই; আপনার নিকট কি আমাকে আশ্রয় দিবেন, যেন আপনি আমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারেন?

(٦٦) وَاَنْتَ جَوَادٌ مَالِجُوْدِكَ سَاحِلٌ ـ فَهَلْ اَنْتَ تُرْوِيْنِىْ اَتَيْتُكَ حَاصِرًا

(৬৬) আপনি সমুদ্রতুল্য দানবীর, আপনার দান সমুদ্রের কূল নাই; আপনি কি আমার পিপাসা দূর করিবেন? আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।

(٦٧) تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ وَاشْفَعْ لِذَنْبِهِ ـ وَكُنْ اَنْتَ لِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَاصِرًا ـ

(৬৭) নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন এবং তাহার গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য শাফাআত করুন এবং আপনি আমার জন্য কেয়ামত দিবসে সাহায্যকারী থাকিবেন।

(٦٨) عَلَيْكَ اُلُوْفٌ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّرَحْمَةٍ ـ وَاٰلَافُ تَسْلِيْمٍ مِّنَ اللّٰهِ عَاطِرًا

(৬৮) আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদ ও রহমত এবং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে (বেহেশতের সওগাতে) সুরভিত সালাম। সালাম! সালাম!! সালাম!!!

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَبِّىْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ ـ فَيَا لَيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِىْ

আমি আমার প্রভুর নিকট এই আকাঙ্ক্ষাই রাখি, আমি যেন মদীনায় অবস্থান লাভ করি। হায়!! মদীনায় আমার কবরের জন্য এক হাত ভূমি ভাগ্যে জুটিবে কি?

رَجَائِىْ بِرَبِّىْ اَنْ اَمُوْتُ بِطَيْبَةٍ ـ فَاَرْقُدَ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرًا

আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা– আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণ প্রিয় নবীজীর ছায়ায় চির নিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহার ছায়ায় হাশরের মাঠেও যাইতে পারি।

تمت بالخير